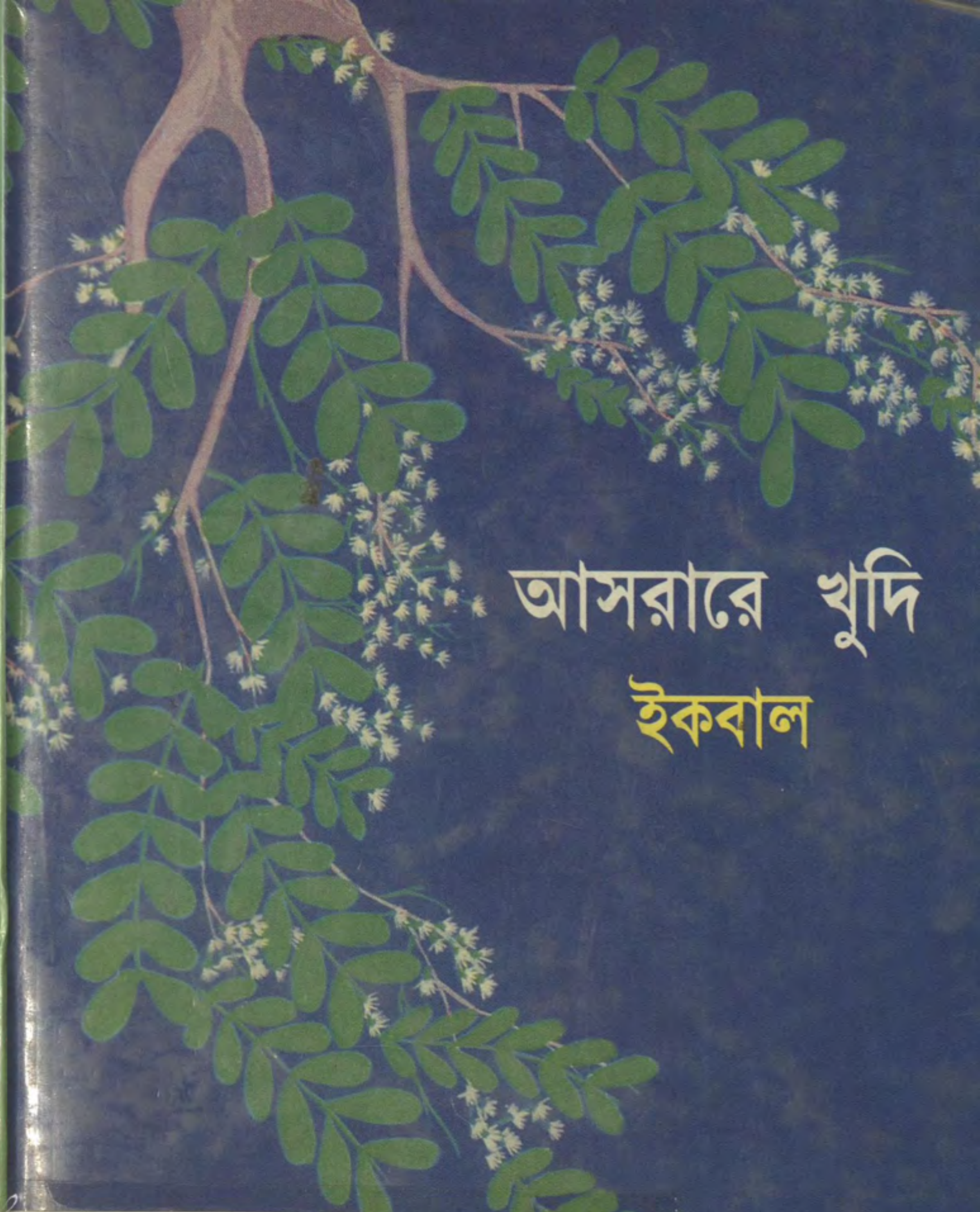

আসরারে খুদি

ইকবাল

00046702

Lutfur Rahman Farooqui
Lecturer/Research Associate
Da'wah Academy
International Islamic University
ISLAMABAD

চিরায়ত গ্রন্থমালা

8U1.66 B11
1QM - A

আসরারে খুদি

ইকবাল

অনুবাদ ।। সৈয়দ আবদুল মান্নান

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
46702
LAHORE

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১১৬

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ

ভাদ্র ১৪০১ ❑ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

প্রকাশক
রবিশঙ্কর মৈত্রী
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৫০০৪৭১

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র কম্পিউটার বিভাগ

মুদ্রণ
সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস
৮/৮ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আমীরুল ইসলাম

মূল্য ॥ পঞ্চান্ন টাকা

ISBN-984-18-0114-X

ভূমিকা

প্রতিভাবান মানুষদের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে যে তাদের মূল অবদানকে ছাপিয়ে তাদের জীবনের কোনো তুচ্ছ বা খণ্ডিত দিক জনচক্ষে বড় হয়ে গিয়েছে। কবি ইকবালের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল তাই। তিনি মূলত ছিলেন কবি ও দার্শনিক। কিন্তু পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে তাঁর পরিচয় উপমহাদেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কবি-দার্শনিক পরিচয়ের চেয়ে বড় বলে একদা তিনি ভেবেছিলেন : ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যেই হোক আর বাইরেই হোক স্বায়ত্তশাসিত ও সংহত উত্তর ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠনই আমার নিকট মুসলমানদের, অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের চূড়ান্ত ভাগ্য বলে মনে হয়। তাঁর এই ভাবনাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি কবলমুক্ত ভারতবর্ষের খণ্ডিত রাষ্ট্র পাকিস্তান-এর ভিত্তি। ইকবালের এই রাষ্ট্রকল্পনায় ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের স্থান ছিল না। অথচ নিয়তির কী পরিহাস, বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষার ফলেই অনেকটা বিকৃত রূপ নিয়ে ইকবাল-কল্পিত রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল। আর এই কারণেই মুখ্যত ইকবাল একসময় বাংলাদেশে হয়ে উঠেছিলেন প্রাসঙ্গিক, হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানমাত্রের কাছেই শ্রদ্ধেয়। তাঁর প্রতি বাঙালি মুসলমানের এই শ্রদ্ধা ছিল যতটা পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে তার কণামাত্রও ছিল না তাঁর প্রধান পরিচয় কবিত্ব বা দার্শনিকতার জন্য। কেবল দু চারজন পণ্ডিতম্মন্যের কাছেই ইকবালের কবিতা ও দর্শন গুরুত্ব পেয়েছিল। বাংলা ভাষায় ইকবাল বিষয়ে চর্চা চলেছিল তাই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত-পূর্বলগ্নে বা পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত-উত্তরকালে।

ইকবালের কল্পনার বিকৃত রূপ নিয়ে যে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পাকিস্তান বাঙালিদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশার নিকট থেকে থেকে অচিরেই দূরে সরে যাওয়ায় বাঙালিদের কাছ থেকে ইকবালও ক্রমশ চলে যেতে থাকেন দূরত্বের অস্পষ্টতায়, তাঁর মহৎ কাব্যপ্রতিভা-দার্শনিকতাও দীর্ঘকাল ধরে অনালোচিত ও উপেক্ষিত হয়ে চলে বাংলাদেশে। অথচ পাকিস্তানের স্বপ্ন-দ্রষ্টা ইকবাল কবি-দার্শনিক তথা সৃষ্টিশীল সমগ্র ইকবালের তুলনায় সামান্যই গুরুত্বপূর্ণ।

ইকবালের পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইকবাল। জন্ম ১৮৭৩ সালের (মতান্তরে ১৮৭৭, মতান্তরে ১৮৭৫, মতান্তরে ১৮৭৬) ২২ ফেব্রুয়ারি বর্তমানে পাকিস্তানের আওতাভুক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের শিয়ালকোট শহরে। ইকবালের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। শিয়ালকোট শহরে পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ-এর ছোটখাট ব্যবসা ছিল। নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও তাঁর বন্ধুমহল বিদ্বান ছিলেন। সেজন্যই হয়ত তিনি পুত্রদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার বিষয়টি অনুভব করেছিলেন গুরুত্বের সঙ্গে। এরই ফলে পরবর্তীকালে শেখ নূর মুহাম্মদ-এর এক পুত্র আতা মুহাম্মদ হয়েছিলেন প্রকৌশলী আর মুহাম্মদ ইকবাল হয়েছিলেন বিখ্যাত কবি ও দার্শনিক।

ইকবালের পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন শিয়ালকোট মারে কলেজের আরবি ও ফারসি ভাষার অধ্যাপক সৈয়দ মীর হাসান। আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি ইকবালের অনুরাগ জন্মে এঁরই সান্নিধ্যের ফলে। শিয়ালকোট থেকে এফ এ পাস করে ১৮৯৫ সালে বি এ ও এম এ ডিগ্রি লাভের জন্য ইকবাল ভর্তি হন লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে। এই কলেজে অধ্যয়নকালেই দর্শন-শাস্ত্রে সুগভীর আগ্রহের কারণে তিনি দর্শন-শাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক টি ডব্লিউ আর্নল্ডের প্রিয়ভাজন হন। এই কলেজ থেকে বি এ এবং এম এ পাস করার পর ইকবাল লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবি ভাষার ম্যাকলিয়ড রিডার পদে নিযুক্ত হন। এর কয়েক বছর পরই লাহোর সরকারী কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের লেকচারারের পদ গ্রহণ করেন তিনি।

এরপর ১৯০৫ সালে আইন অধ্যয়ন এবং দর্শন-শাস্ত্রে গবেষণার জন্য মুহাম্মদ ইকবাল ইংলন্ডে যান। অধ্যাপক আর্নল্ড তখন ইংলন্ডে অবস্থান করছিলেন। তাঁরই পরামর্শে গবেষণার বিষয় হিসেবে ইকবাল বেছে নেন পারস্য-দর্শনকে। ১৯০৭ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এই সময় *The development of Metaphysics in Parsia* নামে পারস্য-দর্শন বিষয়ে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করলে তা বিভিন্ন দার্শনিক মহলে উচ্চপ্রশংসিত হয়। প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা অনূদিত হয় জার্মান ভাষায়। কেমব্রিজে দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নের পাশাপাশি ইকবাল লিংকনস ইন থেকে ব্যারিস্টারিও পাস করেন।

The development of Metaphysics in Parsia শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির জন্য ইকবাল জার্মানির ম্যুনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি লাভ করেন। ম্যুনিখ শহরে অধ্যয়নকালে তিনি জার্মান ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৯০৮ সালে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ইকবাল এবং আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিছুকাল পরে তিনি লাহোরে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৬ সালে তৎকালীন পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০-এ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তিনি। এই অধিবেশনেই ইকবাল ভারতবর্ষে তাঁর কল্পিত মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও ইকবালের অনেক অবদান ছিল। কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন তিনি শিক্ষাব্রতী হিসাবে ; বিদেশ যাবার ফলে তাতে ছেদ পড়ে। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘকাল পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যের দায়িত্ব পালন করেন। বহুবছর ধরে তিনি ছিলেন ওরিয়েন্টাল ফ্যাকলটির ডিন। আফগান রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ সংস্কারের জন্য বাদশাহ নাদির খাঁ যে তিনজন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতকে আহ্বান করেছিলেন ইকবাল ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

তাঁর প্রতিভা বা ক্ষমতার পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয় : একাধারে তিনি ছিলেন প্রতিভাধর বাগ্মী, অসাধারণ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ, কূট রাজনীতিবিদ, একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ যশস্বী আইনবেত্তা, অগ্রণী রাজপুরুষ, দক্ষ অধ্যাপক এবং শিল্পকলার সূক্ষ্ম সমালোচক।

ইকবাল অল্প বয়স থেকেই কাব্যচর্চায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। বিখ্যাত উর্দু পত্রিকা মখজন-এ কবিতা প্রকাশিত হতে শুরু করলে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইংলন্ডে অবস্থানের পর কয়েক বছর কাব্যচর্চা ব্যাহত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফেরার পর

আবার কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন তিনি। মীর্জা গালিবের (১৭৯৬–১৮৬৯) গজল ছিল তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা। ইকবালের কবিতায় একদিকে যেমন রয়েছে নম্র মিস্টিক চেতনা, অন্যদিকে রয়েছে তেমনই তীব্র স্বাদেশিক ভাবনার প্রকাশ। 'স্যারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' এই জনপ্রিয় গানের মধ্য দিয়ে তাঁর সেই নিবিড় দেশানুরাগ স্পন্দিত হয়েছে।

ইয়োরোপ ভ্রমণের পর সেখানকার জীবনযাত্রা দেখে পশ্চিমী জড়বাদে আস্থা হারিয়েছিলেন তিনি। শক্তিপ্রমত্ত ইয়োরোপই তাঁকে ক্রমান্বয়ে 'খুদি' তথা 'আত্ম-উদ্বোধনের' ব্রতে দীক্ষিত করে তোলে। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল : প্রাচ্যদেশ থেকে প্রচারিত ইসলামের আদর্শ পৃথিবীতে আবার মৈত্রী ও মুক্তির মন্ত্র ফিরিয়ে আনবে।

ইকবালের রচনা উর্দু গজলের ক্ষেত্রে নতুন গতির সঞ্চার করেছে। উর্দু গজল একসময় ছিল কেবল সূক্ষ্ম প্রেমভাবনার বাহন ; ইকবালের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সেই গজলে প্রতিফলিত হতে শুরু করে সমকালীন সমাজ ও জীবন।

প্রথম দিকে ইকবাল উর্দুতে কবিতা রচনা শুরু করলেও পরবর্তীকালে ফারসি ভাষা হয়ে উঠেছিল তাঁর ভাবের বাহন। ইকবাল *আসরারে খুদির* এক জায়গায় লিখেছিলেন,

'যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট ইক্ষুর মত
তবু সুমিষ্টতর ফারসি ভাষার ভঙ্গি।
সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হল আবিষ্ট
লেখনী আমার হল পল্লবের মত জ্বলন্ত কুঞ্জের।
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফারসিই হল এর বাহন।'

[অনুবাদ : সৈয়দ আবদুল মান্নান]

ইকবালের উর্দু কাব্যগুলো হচ্ছে : *শিকওয়া (অভিযোগ)* ১৯০৯ ; *জবাব ই শিকওয়া (অভিযোগের উত্তর)* ১৯১১ ; *বাংগ ই দারা (ঘণ্টাধ্বনি)* ১৯২৪ ; *বাল ই জিবরিল (জিবরাইলের ডানা)* ১৯৩৫ ; *যরব ই কালিম (মুসার লাঠি)* ১৯৩৬। তাঁর ফারসি কাব্যগুলো হচ্ছে : *আসরারে খুদি* (আত্মার গান) ১৯১৫ ; *রমুজ ই বেখুদি (আত্মলোপের রহস্য)* ১৯১৮ ; *পয়জাম ই মাশরিক (প্রাচ্যের বাণী)* ১৯২৩ *যবুর ই আজম (ডেভিডের স্তোত্র)* ১৯২৭ ; *জাবিদনামা (অমরলিপি)* ১৯৩২ ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত *আরমগান ই হিজাজ (হিজাজের অভিনব উপহার)*

কবিতার বইগুলো ছাড়াও ইংরেজি গদ্যগ্রন্থ *The Reconstuction of Rligious Thought in Islam* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মাদ্রাজের এক সাহিত্য-সমাজের আমন্ত্রণে ইকবাল যে ছয়টি বক্তৃতা দেন তা এতে স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন : আত্মশক্তির দর্শনকে তিনি ক্রমে এশিয়ার নানান সমস্যার সঙ্গে যুক্ত ক'রে, বিশেষ ভাবে ইসলামীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে এবং ভারতবর্ষে তাঁর আপন সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। আশ্চর্য প্রাঞ্জল তাঁর একটিমাত্র গদ্যগ্রন্থ *The Reconstuction of Rligious Thought in Islam*-এ শক্তিসাধক কবির পরিণত চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে কোরানশরিফ এবং ইসলামীয় বিজ্ঞান দর্শনের প্রগাঢ় সুন্দর আলোচনা আছে, তর্জমাগুলিও চমকপ্রদ।

উর্দু ভাষাভাষী কবিদের মধ্যে ইকবাল জনপ্রিয়তম কবি। যদিও তাঁর কাব্যসৃষ্টির ভাষা কেবল উর্দু নয়, তাঁর কাব্য সৃষ্টির এক বিরাট অংশ পথ খুঁজে নিয়েছে ফারসি ভাষার মধ্য

দিয়ে, তবু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতবর্ষীয় কবিদের মধ্যে কেবল ইকবালের ভাগ্যেই জুটেছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতি। আন্তর্জাতিক খ্যাতির উৎস রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি ইয়েটসের অনুবাদ '*গীতাঞ্জলি*'; আর ইকবালের ক্ষেত্রে রেনল্ড নিকলসনের অনুবাদ '*আসরারে খুদি*' (*secrets of the self*)। এই দুই কবি শ্রদ্ধা করতেন পরস্পরকে। দুজনের সৃষ্টিতেই রয়েছে কিছু সাধারণ বিষয়ের সাদৃশ্য। যেমন দু জনেই ভালোবাসতেন দেশকে ; প্রাচ্যদেশসমূহের প্রতি অনুরাগ ছিল উভয়েরই। দুই কবিরই মানবতাবাদী চেতনা ছিল বৈশ্বিক। দুজনেই রোমান্টিক ; দুই কবিই স্বপ্ন দেখতেন সমগ্র বিশ্বের এক সুন্দরতর ভবিষ্যতের। তবে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের চিন্তাধারার গতিপথ ছিল ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের পথ শান্তি ও সাম্যের; ইকবালের পথ সংগ্রামের। (শঙ্খ ঘোষের ভাষা একটু বদলে) রবীন্দ্রনাথ 'নূতন সভ্যতার বিন্যাসের কথা ভাবতে গিয়ে তপোবনের ভারতবর্ষের বর্ণনা' করেন, 'পুরাণ বা উপনিষদের নানা শ্লোকে প্রশ্রয় খোঁজেন বারে বারেই'—আর ইকবালের ভাবনায় সভ্যতার অনেক 'সমাধান-সূত্র' থেকে গেছে কোরানের মধ্যেই। ইকবালের *জাভিদনামার* ভাষায় :

কোরান কাকে বলে? সে হল ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা, আর
অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস—কোরান আশ্রয় তার।
আমরা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটিজল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার এক আত্মাই।
মনের ভিতরে তা পৌঁছে যায় যদি বদল হয়ে যায় মনে
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে।

[অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ]

ইকবাল আর রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ভাববাদী অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্থক্য তাঁদের দুস্তর। ভাববাদই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। অন্যদিকে ইকবাল নিদ্রাকর ওষুধরূপে ভাববাদকে গ্রহণ করার কুফলের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্কীকরণের জন্য এবং একটা চলমান কর্মোন্মাদনা সৃষ্টির জন্য ভাববাদকেই ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আবদুল মান্নান বলেন : তাঁর (ইকবালের) মতে প্রাচ্যদেশের বহু বিপত্তির মূল কারণ হচ্ছে আল্লার দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজের কাজে লাগাতে না পারার ভেতরে। ইকবালের দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে দর্শন-শাস্ত্রের আর এক পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী ইকবাল-দর্শনকে চিহ্নিত করেছেন ভাববাদের বিরুদ্ধে আর এক ভাববাদী প্রতিবাদ হিসাবে।

ইকবালের সমগ্র কাব্য অভিনিবিষ্টভাবে পাঠ করলে দেখা যায় যে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মূল উৎস হচ্ছে তাঁর দার্শনিকতা। আর এই দার্শনিকতার সারকথা হচ্ছে মানুষের মুক্তি তার 'খুদি'কে বা অহং'কে উপলব্ধি করে তাকে জাগ্রত করে তোলা বা বিকশিত করে তোলার মধ্যে। অর্থাৎ মানুষের জীবনের মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাকে অনুসরণ করতে হবে শক্তি ও সাহসের আদর্শকে। ইকবালের মতে মানুষের জীবনের উচ্চতম ও মহান লক্ষ্যটি হচ্ছে মানবতার সেবা। তাঁর বিশ্বাস ছিল মানবতার সেবা করার এবং মানব জীবনের সকল বৈষম্যকে বিতাড়ন করার সর্বোত্তম উপায় ইসলামের পথে চলা।

বাংলা ভাষায় ইকবালের কাব্য বিষয়ে এযাবৎ রচিত আলোচনাগুলোর মধ্যে তিরিশের দশকের কবি অমিয় চক্রবর্তীর লেখা *যুগসংকটের কবি ইকবাল* এবং *ইকবাল-কাব্যের*

নতুন প্রসঙ্গ রচনা দুটি অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং মুক্তদৃষ্টিভঙ্গির কারণে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। সেজন্য অমিয় চক্রবর্তীর এই দুই রচনা থেকে নির্বাচিত কিছু অংশ উদ্ধৃত করে ইকবাল কাব্যের পরিচয় তুলে ধরা হল :

> কাব্যের বিচারে অস্ফুট কীটদষ্ট কোরক অথবা বিকৃত পত্রাবলীর সাক্ষ্য বর্জন ক'রে শাখার প্রান্তে প্রচ্ছন্ন একটি সুন্দর ফুলের অভাবনীয় পরিচয় দেওয়াই প্রশস্ত। কবি ইকবালের কাব্যকাননে বিচরণ করলে সৌরভী কুঞ্জ দেখতে পাব, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামলচ্ছায়া মেলে আছে ; অগণ্য মনোহর বীথি আহ্বান ক'রে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যের ভঙ্গি, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্তদৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তাঁর বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম ক'রে সর্বমানবের চিত্তচারী। তাঁর কাব্যে রাষ্ট্রিক মতামতের কাঁটা–বেড়া দেখা দিলেও প্রতিহত হয় না ; কাণ্ডের শুষ্ক বক্রতা লঙ্ঘন করে উঁচু ডালের কম্পমান পল্লবলোকে পৌঁছনোর সাধনা পাঠককে মানতেই হবে। ...
>
> প্রতিভার অরুণপর্বে তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় কবি। বেদমন্ত্রের স্পর্শ লেগেছিল তাঁকে, কোরানের আজান যেন চলেছে গীতাধ্যয়নেরই পর–প্রকোষ্ঠে ; মন্দির মসজিদ, শিখ সুফী দরবেশ ব্রাহ্মণ স্থান পেল তাঁর গীতিকবিতার সুন্দর আসনে। কবিতা লিখেছেন স্বামী রামতীর্থের উপরে, শিখগুরু নানক সম্বন্ধে ; মুসলমান সন্ত–সাধকের প্রসঙ্গ স্বভাবতই বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে। ...
>
> তাঁর কাব্যের প্রথম পর্বে ভারতীয় সচেতনার সংগীত বেজেছিল ; য়ুরোপের বিশ্বভুক্ ঔদার্য তখনো আফ্রিকায় এসিয়ায় চরম হয়ে ওঠে নি ; কিন্তু চতুর্দিকের প্রচ্ছন্ন আয়োজন অগোচর ছিল না। সংকটের সেই প্রদোষকালে ভারতের মৈত্রীভাবনা সমগ্র ভারতবর্ষকে আরো আপন ক'রে চেয়েছিল ; তখন আমাদের বৃহৎ জাতীয়তা অসাম্প্রদায়িক, সর্বপ্রাদেশিক একটি সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করতে প্রবৃত্ত। কাব্যের সেই অরুণযুগে ইকবাল ললিতে ভৈরবে গান বেঁধেছিলেন। ভারতবর্ষের বড়ো আকাশে তাঁর সঞ্চরণ। ...
>
> প্রথম পর্যায়ে তাঁর কবিতাগুলিতে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যময় রূপ কত স্পষ্ট, এবং সেই কারণে বহির্ভারতকে গ্রহণ করতেও তিনি কিরকম উৎসুক। *"বাং–ই–দারা"* (কারাভানের ডাক) বই বেরিয়েছিল ১৯২৪ সালে, উর্দু ভাষায় ; তাতে তাঁর স্বাদেশিক চেতনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই। ...
>
> এগারো বৎসর পরে ইকবাল দ্বিতীয় উর্দু কাব্যগ্রন্থ রচলেন, কিন্তু *"বাল্–ই–জিব্রাইল"* (গেব্রিয়েলের পাখা) বেরোবার মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে পারসিক ভাষায় লেখা গ্রন্থগুলিতে তিনি শুধু উচ্চাঙ্গের মিষ্টিক কাব্যসৃষ্টি নয়, ভারতসংস্কৃতির পটভূমিকায় তাঁর গভীর সর্বজাতীয় বোধকে প্রকাশ করেছেন। ইউরোপীয় সংঘশক্তির আঘাতে তাঁর স্বাদেশিকতা জেগে উঠেছিল ; সমস্ত দেশকে এক ক'রে আমরা মাথা তু'লে দাঁড়াব, মানবমহাযাত্রায় যোগ দেব—এই তাঁর সংকল্প। ...
>
> ভারতীয় ঐক্যের এই মুগ্ধ ধ্যান কবি ইকবালকে নিয়ে গেল বিশ্বলোকালয়ে, সেখানে নেশন–এর চেয়ে সত্য জনসাধারণ, জাতীয়তা সর্বজাতীয়, সেখানে মিলনের বাধা ঘুচে যায় :

নেশনগুলির থামাও ঐ বেসুরো ঝংকার,
তোমারই সংগীতে আমাদের কানকে করো স্বর্গীয়,
ওঠো, বাঁধো সুর ভ্রাতৃত্বের বীণায়,
ফিরে দাও পেয়ালা ভরে প্রেমের সুরা!

যৌবন শেষ পর্যন্ত ইকবালের গীতিকাব্যে এই একটা মূল ধুয়ো, তাঁর কল্পনার প্রসঙ্গ কত সহজ, মাটির কত কাছাকাছি, অথচ সূক্ষ্ম ভাবনায় শিল্পিত ; নির্বিশেষে গ্রহণ করেছেন বিভিন্ন প্রাদেশিক স্বদেশীয়কে। কবিতার পাত্রটি গড়েছিলেন ভারতীয় ধাতু দিয়ে, তাতে বসল ইস্পাহানি নীলা, ভাষার মিশ্রিত কত রং, মুসলিম আরবীয় উজ্জ্বল চিন্তার মণি। কাব্যের শাশ্বতকে তিনি কোনোদিনই ভোলেন নি, বড়ো করেছেন প্রেরণার দৈবকে ; জানতেন সংকীর্ণ স্বার্থের সাধনায় প্রকাশ নেই। ...

লেনিন-এর জবানিতে ইকবাল ঘোষণা করলেন :

য়ুরোপে আলো, জ্ঞান এবং শিল্প দেখো আজ অপর্যাপ্ত। ...

সাম্রাজ্য-ব্যবসায়কে কেন্দ্র ক'রে ধনিক-সভ্যতার নির্লজ্জ বিক্রম ইকবালের কাছে অপরিসীম ঘৃণার্হ ছিল। কিন্তু ধর্মের অনুষ্ঠানকে তিনি বর্জন করতে চান নি, ধর্মকে তো নয়ই ; কম্যুনিজ্‌ম্-এর সঙ্গে তাঁর প্রভেদের এইটে মূল কারণ মনে হয়। ...

তাঁর চিত্তের পরিচয় স্পষ্টতর দেখতে পাই ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর আদর্শিক ছবিতে, যে-আদর্শ পৃথিবীকে নূতন ক'রে মৈত্রী এবং মুক্তির বিশেষ সন্ধান দেবে। পূর্বদেশ হতে জাগবে সেই উত্তর ; অন্য উত্তরের মধ্যে একটি ; কিন্তু য়ুরোপ সম্বন্ধে তিনি আশার কথা ব'লে যান নি। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোনো প্রবল শক্তিমান নেতা অন্যদের সাময়িক পরাভূত দণ্ডিত করলে তিনি আকৃষ্ট হতেন, কিন্তু অন্তরের আকর্ষণে নয়। ...

মোটের উপর ইকবালের মন সমস্ত য়ুরোপকে সমীকৃত ক'রে এবং অবিচিত্ররূপে দেখেছিল। পশ্চিম-সভ্যতার তলে যে-সকল বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া চলছে, নূতন সভ্যতার উদ্যোগ এবং আগমনের সে-দিকটায় তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। সেখানেও যারা পূর্বদেশীয় অত্যাচারিতদের মতোই সাম্রাজ্যবাদী ধনিকের পদপিষ্ট, এবং যারা আক্রান্ত হয়েও অপরিসীম বীর্যের দৃঢ়তায় সমস্ত মানুষের দায়িত্ব বহন করছে তাদের পরিচয় ইকবালের লেখায় পাই নি। পূর্ব-য়ুরোপ এবং পশ্চিম-য়ুরোপের সকল শ্রেণীকেই তিনি খরশরবিদ্ধ করেছেন, অফুরন্ত ছিল তাঁর তূণ। ...

পূর্বদেশীকে বারেবারে বলেছেন, সাবধান, নিয়তপ্রসারী বিশ্বভুক্ সভ্যতার দ্রংষ্ট্রা হ'তে এখনো নিজেকে বাঁচাও ; লজ্জা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আঘাত ক'রে যেমন ক'রে হোক তিনি শক্তি ফিরিয়ে দেবেন শক্তিহীনদের। ...

প্রবল উন্মুক্ত যথার্থ মানব-সভ্যতার কথা বলতেই আরব্য দিগন্ত জাগ্রত ইকবালের চিত্তে, আহ্বান সে পৌঁছত মরুবেষ্টিত মরূদ্যান থেকে। আধুনিক মন নিয়েই তিনি ফিরে যেতেন রৌদ্রপ্রখর প্রাচীন ইসলামীয় ইতিহাসে ; সেই ইতিহাস বিশেষ ধর্মসাধনার এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু তার ক্রিয়া বিশ্ব-ইতিহাসের অন্তর্গত। নূতন তেজস্ক্রিতার বাণী তিনি শুনেছিলেন দূরে

বেদুয়িনের তাঁবুতে, কারাভানের আদিম তাম্র-পার্বত্য পরিবেশে ; পথের উপরে প্রজ্জ্বলিত স্বচ্ছ মরু-রাত্রির নক্ষত্র-দৃষ্টিতে। ...

মুসলিম ঐতিহ্যের স্মরণে স্বপ্নে, ভবিষ্যতের ছবিতে ইকবালের মন স্তরে-স্তরে অভিষিক্ত ছিল। ...

মানব-সভ্যতার উপর তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল, হয়তো ভেবেছিলেন ইসলামীয় আদর্শ যথার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিতে পারলে পশ্চিম-দেশেও পরিবর্তন ঘটবে। পূর্ব-দেশের কোনো উৎকর্ষকে তিনি আঘাত করেন নি, ছোটো ক'রে দেখেন নি। নিজ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে তিনি নিয়ত সতর্ক ছিলেন, বারেবারেই তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতের শত্রু বলে ঘোষণা করেছেন। ...

মিলের চুমকি-বসানো, অনুপ্রাসবহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদ রচনার মাঝখানে গীতিকাব্যরসের পরিপূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর। ধরা পড়ত, ইকবাল শুধুমাত্র শিল্পদক্ষ পরিবেশধর্মী এমনকি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠপ্রচারী কবি নন, সংকটযুগের দ্বন্দ্বকেই তিনি আশ্চর্য প্রকাশ করেন নি, তাঁর প্রথম পর্বের সূর্যকাল শেষ পর্যন্ত অন্তরে অনাচ্ছন্ন ছিল, কাব্যের সূত্রে গাঁথা হয়েছিল তারই অম্লান রাগিণী। আসন্ন দুর্যোগের পারে মুশকিল আসান্-এর বাণী তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু ঝড়ের দোলায় তিনি ভয় করেন নি ; তাঁর কাব্যকে দেখে শেষ পর্যন্ত চেনা যেত তার গড়ন দূর-উজানী, তাতে ছুঁয়ে আছে উত্তাল দিগন্তরেখা। ...

ইকবাল অমর। যে-পরিচয়ে তাঁর সৃষ্টিকাব্যের শীর্ষতা তা দুর্বল শরীর-মনের অবান্তর প্রসঙ্গ এমনকি কাব্য-বিরোধী প্রভাবকে অতিক্রম করে ভাস্বর হয়ে রইল। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত *"আর্মিঘান-ই-হিজাজ"* কাব্যগ্রন্থে মানবিক বোধান্বিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা বেরিয়েছিল, আজও তার পরিচয় বৃহত্তর ভারতবাসীর কাছেও অগোচর বললেই হয়,— বাহিরের জগতে কোনো বার্তাই পৌঁছয় নি। সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ক'রে রেখে ইকবালকে যাঁরা বিশ্বের বাহিরে রাখতে চান তাঁদের দায়িত্ববোধ ক্ষীণ বলতে হবে। কেবলমাত্র যে-কবিতাগুলি সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক তারই ব্যাখ্যান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে ইকবাল মুসলমান কি হিন্দু অথবা ভারতীয় নন, তিনি এশিয়ার কবি বললেও যেখানে তাঁর মানবিকতাকে ক্ষুদ্র করা হয় তার তর্জমা কোথায়? ...

দৈবাৎ যদি আধুনিক কোনো কবি ইকবালের *'ইব্লিস কি মজলিস্-ই-সউরার'* ('শয়তানের মজলিস্') কবিতাটির সন্ধান পান তাহলে নূতন ইকবালের আবির্ভাবে বিস্মিত হবেন। ...

কবিতাটিতে ছন্দোবদ্ধ কথোপকথনের ছলে বর্তমান যুগের ধনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধার্মিক উগ্রতা প্রভৃতি বিপদগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা আছে ; সবার উপরে উড্ডীন নূতন জাগ্রত মানবধর্মের নিশান। মুখ্যত ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে লক্ষ্য করে কবিতা গঠিত, কিন্তু এই কাব্যের তাৎপর্য সকলেরই অবাধ-গ্রহণীয়। শ্রেষ্ঠতার একটি প্রতীকরূপে যে লোভহীন, আদর্শিক, ত্যাগ-ভূষিত ইসলামের সর্বধর্মপ্রেমশীলতার বাণী এই গভীর লীলাকৌতুকী কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে তা যথার্থই অভিনব। ...

সাংবাদিক–সাহিত্যক সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪–১৯৮০) বাংলা ভাষায় ইকবালের *আসরারে খুদির* প্রথম অনুবাদক। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫০–এ। এরপর আর কোনো সংস্করণ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। *আসরারে খুদির* বর্তমান অনুবাদটি প্রকাশের পরপরই সাহিত্যক মহলে সমাদৃত হয়েছিল এর ভাষার স্বচ্ছতা–প্রাঞ্জলতা এবং মূলানুগতার কারণে। অনুবাদের সময় মূলভাবের বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে বলে অনুবাদক ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ না করে গদ্যানুবাদ করেছেন।

বাংলা ভাষায় ইকবাল সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন বা ইকবালের কবিতা বাংলায় যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী অবদুল ওদুদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ অলী, অমিয় চক্রবর্তী, আবুল ফজল, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আবদুল মান্নান, সৈয়দ আলী আহসান, মনিরুদ্দিন ইউসুফ, শঙ্খ ঘোষ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইকবালকে দেখার মধ্যে বা ইকবালের মহত্ত্বের দিকে না তাকানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, নেই কোনো গৌরব। ভারতবর্ষের খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন আমাদের গৌরব করার মত তেমন কিছু ছিল না সেই সময় আমরা পেয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর ইকবালকে। তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা যেমন বিবেচনা করি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তেমনি ইকবালকেও বিবেচনা করা উচিৎ আমাদের। বাঙালিত্বের সম্পন্নতার জন্য রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হলে ইকবাল গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ রবীন্দ্রনাথ মানবতাকে যেমন অন্বেষণ করেছেন উপনিষদে তেমনি ইকবাল অন্বেষণ করেছেন কোরানে; দুইই বাঙালিত্বের চেতনায় লীন।

দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ইকবালের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যের অনুবাদটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র আওতায় প্রকাশ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আহমাদ মাযহার
৩৫ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ঢাকা–১২০৫

16-6-96

পূর্বাভাষ

বিশ্ব-উজ্জ্বলকারী সূর্য
যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল রাত্রির বুকে
দস্যুর মত,
আমার কান্নার অশ্রু
শিশির-সিক্ত করে তুলল
গোলাব-পাপড়ির মুখ।
আমার অশ্রু
ধুয়ে নিয়ে গেল নিদ্রা
নার্গিস ফুলের আঁখি থেকে,
আমার অনুরাগ
জাগ্রত করে দিল তৃণরাজিকে
আর করল তাদেরকে বর্ধিষ্ণু।
মালী পরীক্ষা করলে
আমার সঙ্গীতের শক্তি,
সে বপন করল আমার সঙ্গীত
আর আহরণ করলে একখানি তরবারি।
মৃত্তিকার বুকে
সে বপন করল আমার অশ্রুর বীজ,
বয়ন করল আমার আর্তনাদ
বাগিচার সাথে
তাঁতের সূতার মত।

যদিও আমি একটি ক্ষুদ্র পরমাণু মাত্র,
তবু অত্যুজ্জ্বল বিভাময় সূর্য আমারই ;
বক্ষোমাঝে আমার
শতেক পূর্বাশার আলো।
আমার ধূলিকণা
জামশেদের সুরাপাত্রের চাইতে উজ্জ্বলতর,
সে জানে সেই সব পদার্থকে
যারা আজো জন্ম নেয় নি এই বিশ্বে।

আমার চিন্তাধারা
ছিনিয়ে এনেছে এক মৃগীকে,
যে আজো ছুটে আসে নি প্রকাশমান হয়ে
অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে।
সুন্দর আমার বাগিচা,
পত্রপুট তার তারুণ্যে সবুজ ;
আমার পরিচ্ছদের মাঝে
লুক্কায়িত আছে
কত অস্ফুট গোলাব।
মূক করে দিয়েছি আমি সেই গায়কমণ্ডলীকে
যারা মিলিত হয়েছিল
এক জলসায়,
আঘাত দিয়েছি আমি
সারা বিশ্বের হৃদয়-গ্রন্থিতে,
কারণ আমার প্রতিভার বাঁশিতে
নিহিত রয়েছে
এক অভূতপূর্ব সুর ;
সঙ্গীত আমার নূতনতম
আমার সঙ্গীদের কাছেও।

জন্ম নিয়েছি আমি এই ধরিত্রীর বুকে
নবীন সূর্যের মত,
আকাশের নীহারিকা-লোকের সাথে
নেই আমার পরিচয় ;
এখনো আত্মগোপন করে নি তারকারাজি
আমার আলোকৈশ্বর্যের সম্মুখে,
আমার তাপমানের পারদ আজো হয় নি স্থির ;
আমার নৃত্যপর আলোকরশ্মি
আজো স্পর্শ করে নি সমুদ্রের বুক,
আমার রক্তিম আভা
আজো স্পর্শ করে নি পর্বতের শিখর।

অস্তিত্বের আঁখি
আজো নহে পরিচিত
আমার কাছে ;
জাগ্রত হয়ে উঠি আমি কম্পায়মানভাবে,
ভীত আমি নিজকে প্রকাশ করতে।
আমার উষা সমাগত হল

প্রাচী-র তোরণ থেকে
আর মিশে গেল রাত্রির অন্ধকারে,
একটি নবীন শিশির বিন্দু
পড়ল বিশ্ব-গোলাবের মুখে।
প্রতীক্ষা করছি আমি সেই ভক্তদের
যারা উত্থান করে ঊষালোকে ;
ওগো সুখী তারাই,—
যারা পূজা করবে আমার অন্তরের অগ্নিকে !
প্রয়োজন নেই আমার আজকের মানুষের কর্ণের,
আমি বাণী
অনাগত যুগের কবির।
হৃদয়ঙ্গম করে না আমার বাণীর গূঢ় অর্থ
আমার নিজের যুগ,
ইউসুফ আমার এই বাজারের জন্য নয় !
হতাশ আমি আমার প্রাচীন সঙ্গীদের জন্য ;
আমার সিনাই দগ্ধ হয়
সেই মুসার জন্য—
যে আসবে ভবিষ্যতে।

সমুদ্র তাদের শান্ত নিস্তরঙ্গ
শিশিরের মত,
কিন্তু শিশির আমার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ
মহাসমুদ্রের মত।
আমার সঙ্গীত আর এক পৃথক জগতের
তাদের থেকে ;
এই বংশী আহ্বান করে আর সব পথচারীকে
পথ ধরবার জন্য।

জন্ম নিয়েছিল কত কবি
তার মৃত্যুর পরে,
খুলে দিয়েছিল আমাদের আঁখি
যখন তার নিজের আঁখি হল নিমিলিত।
চলতে লাগল আবার সম্মুখের দিকে
অনস্তিত্ব থেকে,
ফুটনোন্মুখ গোলাবের মত
তার সমাধি-মৃত্তিকার উপর।
যদিও কত কাফেলা
অতিক্রম করে গেছে এই মরুভূমি,

তারা চলেছিল,
যেমন চলে উষ্ট্র
নিঃশব্দ পাদক্ষেপে।

আমি একজন প্রেমিক ;
উচ্চ নিনাদ আমার ধর্ম ;
রোজ কেয়ামতের চীৎকার
আমার কাছে তোষামোদ।
আমার সঙ্গীত
তন্ত্রীর শক্তিকে করেছে অতিক্রম
তবু আমার ভয় নেই বাঁশি ভেঙে যাবার।

আমার স্রোতের সাথে পরিচয় না হওয়াই ছিল ভালো
সেই বারি-বিন্দুর,
তার ভয়ংকর রূপ বরং উন্মাদ করে দেবে
মহাসমুদ্রকে।

কোনো নদী
ধরতে পারবে না আমার ওমানকে ;
সমস্ত সমুদ্রের প্রয়োজন
ধরে রাখতে আমার বাত্যা।
যদি কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে
না হয় গোলাবের আস্তরণ,
কোনো মূল্য নেই
আমার বসন্ত-মেঘের করুণার।
বিদ্যুৎ-ঝলক তন্দ্রাভিভূত হয়ে আছে
আমার আত্মার ভিতরে।
বয়ে চলি আমি
পর্বত ও সমতলের উপর দিয়ে।

যুদ্ধ কর আমার সমুদ্রের সাথে,
যদি তুমি হও সমতলক্ষেত্র ;
গ্রহণ কর আমার বিদ্যুৎ-চমক,
যদি তুমি হও সিনাই।
আমায় দেওয়া হয়েছে আবে-হায়াত
পান করতে,

আমি হয়েছি মহাজ্ঞানী
জীবন-রহস্যের।
ধূলিজাল শক্তি সঞ্চয় করেছে
আমার অগ্নি-গীতি থেকে ;
বিস্তার করেছে সে তার পক্ষ,
পরিণত হয়েছে খদ্যোতে।
কেউ বলে নি সেই রহস্য, যা বলব আমি,
অথবা বিস্তার করে নি চিন্তার রত্ন
আমার মত।

এস,—
যদি তুমি জানতে চাও
চিরন্তন জীবন-রহস্য !
এস,—
যদি তুমি চাও
স্বর্গ-মর্ত্যকে জয় করতে !
স্রষ্টা শিখিয়েছেন আমায়
এই সঙ্গীত,
আমি পারি না তা গোপন করতে
আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে।

ওগো সাকি !
ওঠ,—ঢাল সুরা আমার পাত্রে,
কালের কোলাহলকে কর দূরীভূত
আমার অন্তর থেকে !
জম্‌জম্ থেকে বয়ে আসে
যে উজ্জ্বল সুরা,
যদি ভিখারীও করে তার পূজা
সে হয়ে উঠবে রাজ্যেশ্বর।
তাতে চিন্তাকে করে তোলে
আরো প্রশান্ত—জ্ঞানময়,
তীক্ষ্ণ আঁখিকে করে তোলে তা তীক্ষ্ণতর।
তৃণকে সে প্রদান করে পর্বতের ভার,
শৃগালকে দেয় সিংহের শক্তি।
ধূলিকণাকে তা তুলে নেয় সপ্তর্ষি-মণ্ডলে,
আর বারিবিন্দু ফুলে উঠে
ধারণ করে সমুদ্রের আকার।

রোজ কেয়ামতের কোলাহলের মাঝে
আনে সে গভীর নিস্তব্ধতা
তিতির পক্ষীর পদযুগল রঞ্জিত করে সে
বাজ পক্ষীর শোণিতে।

ওঠ,—ঢাল আমার পিয়ালায়
স্বচ্ছ সুরা,
এনে দাও চন্দ্রালোক
আমার চিন্তার অন্ধকার নিশীথিনীর বুকে,

যেন আমি পারি
ফিরিয়ে আনতে মুসাফেরকে তার গৃহে,

আলস্যপরায়নদের মাঝে আনতে পারি
অশান্ত ব্যাকুলতা ;
যেন এগিয়ে যেতে পারি উৎসাহের সাথে
নূতনের সন্ধানে—
আর পরিচিত হতে পারি
নূতনের অগ্রদূতরূপে ;
অক্ষি-তারকার মত হতে পারি
অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন মানবের কাছে,
যেন প্রবিষ্ট হতে পারি বিশ্বের কর্ণে
কণ্ঠস্বরের মত ;
বর্ধন করতে পারি কাব্যের মূল্য,
আর অভিষিক্ত করতে পারি
শুষ্ক গুল্মকে
আমার অশ্রুবিন্দু-পাতে।

রুমীর প্রতিভায় অনুপ্রাণিত আমি
আবৃত্তি করে যাই গোপন রহস্যের মহাগ্রন্থ।
আত্মা তার জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড,
আমি শুধু স্ফুলিংগ—
যা জ্বলে ওঠে মুহূর্তের জন্য।

জ্বলন্ত দীপশিখা তাঁর
গ্রাস করেছে আমায় পতংগের মত,
তাঁর সুরা
কানায় কানায় পূর্ণ করেছে আমার পিয়ালা।

রুমী স্বর্ণে পরিণত করেছিলেন
আমার মৃত্তিকাকে,
আর আমার ভস্মকে করেছিলেন
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।
বালুকণা উঠে এল মরুভূমি থেকে,
যেন সে ছিনিয়ে আনতে পারে
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য।

আমি একটি তরঙ্গ,
আসব আমি বিশ্রাম নিতে
তাঁর সমুদ্র-বুকে,
যেন আমি আপনার করে নিতে পারি
তাঁর দীপ্তিমান মুক্তারাজি।
আমি তাঁর সঙ্গীতের সুরায় মাতাল,
জীবন সঞ্চয় করি আমি
তাঁর বাণীর হাওয়া থেকে।
তখন রাত্রি,
অন্তর আমার শোকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ,
নিস্তব্ধতার বুক ভরে দিল
আমার ফরইয়াদ
বিশ্বপ্রভুর কাছে।
অভিযোগ করছিলাম আমি
বিশ্বের দুঃখ-ব্যথার জন্য,
বিলাপ করছিলাম
আমার পিয়ালার শূন্যতায়।
অতঃপর আঁখি আমার
পারল না আর সহ্য করতে,
পরিশ্রান্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ল
গভীর ঘুমে।
আবির্ভূত হলেন সেই পীর,
সত্যের উপাদানে যিনি গঠিত,—
লিখেছিলেন যিনি কোরান ফারসি ভাষায়।

বললেন তিনি,—
"ওগো উন্মত্ত প্রেমিক,
পান করে নাও প্রেমের স্বচ্ছ সুরা।
আঘাত কর তোমার হৃদয়-গ্রন্থিতে,
জাগিয়ে তোল তাতে উদাত্ত সুর,

নিক্ষেপ কর তোমার মস্তক পিয়ালায়
আর তোমার আঁখি অস্ত্রমুখে!
করে তোল তোমার হাস্য
শতেক দীর্ঘশ্বাসের উৎসমুখ,
মানবের অন্তর হোক রক্তাক্ত
তোমার অশ্রুজলে!
কতকাল থাকবে তুমি নীরব
কুঁড়ির মত?
বিক্রয় কর তোমার সুরভি সুলভে
গোলাবের মত!

জিহ্বা তোমার আড়ষ্ট বেদনায়;
নিক্ষেপ কর নিজকে অনল-কুণ্ডে
ইন্ধনের মত!
ঘন্টার মত ভঙ্গ কর নিস্তব্ধতা,
আর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে
উচ্চারণ কর বিলাপ-ধ্বনি!

তুমি অগ্নি:
পরিপূর্ণ কর সারা বিশ্ব
তোমার আলোয়।
দগ্ধ কর অপরকে তোমার দাহনে!
ঘোষণা কর রহস্য
সেই প্রাচীন সুরা-বিক্রেতার;
তুমি হও সুরার তরঙ্গ,
স্বচ্ছ পিয়ালা হোক তোমার বসন।
চূর্ণবিচূর্ণ কর ভয়ের দর্পণকে,
বোতল ভেঙে দাও বাজারের মধ্যে!
নলের বাঁশির মত
নিয়ে এস বাণী নল-বন থেকে;
মজনুর কাছে বয়ে আন সন্দেশ
লায়লার কাছ থেকে!
সৃষ্টি কর নূতন ধারা তোমার সঙ্গীতের,
ঐশ্বর্যশালী করে তোল সমাজকে
তোমার উদ্যমে।
ওঠ, প্রেরণা দাও আবার

* 'সুরা' মানে এখানে ঐশী প্রেমের রহস্য।

প্রত্যেক জীবিত আত্মাকে ;
বলো,—'জাগ্রত হও',—
আর তোমার বাণীর যাদুতে
জেগে উঠুক জীবন্ত আত্মা !
ওঠ,—বাড়িয়ে দাও তোমার চরণ
অন্যতর পথে ;
দূর কর সব অতীতের
এক-ঘেয়েমীর তন্দ্রা !
সঙ্গীতের আনন্দের সাথে হও পরিচিত ;
ওগো কাফেলার ঘণ্টা,
জেগে ওঠ !"

বক্ষ আমার আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল
এই বাণীতে,
উৎসাহে উদ্দীপনায় ফুলে উঠল
বংশীর মত ;
আমি জেগে উঠলাম,—
যেমন করে জাগে সঙ্গীত তন্ত্রী থেকে,
নির্মাণ করতে এক ফির্‌দাউস্‌
মানব-কর্ণের জন্য।
তুলে দিলাম আমি পর্দা
আত্মার রহস্যের,
খুলে দিলাম তার বিস্ময়কর গোপন-তত্ত্ব।
সত্তা ছিল আমার একটি অসমাপ্ত মূর্তি,
অসুন্দর, মূল্যহীন, অশোভন।
প্রেম করল আমায় পূর্ণ :
আমি হলাম মানুষ,
জ্ঞান লাভ করলাম বিশ্ব-প্রকৃতির।
দেখেছি আমি আকাশের স্নায়ুসমূহের গতি,
চন্দ্রের শিরায় প্রবাহিত
শোণিত-ধারা।
কত রাত্রি ধরে
ক্রন্দন করেছি আমি মানবের জন্য
যেন আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারি
জীবন-রহস্যের পর্দা ;
তুলে আনতে পারি জীবনের গঠন-রহস্য
প্রকৃতির বিজ্ঞানাগার থেকে'

আমি সৌন্দর্য বিতরণ করি রাত্রিকে
চন্দ্রের মত,
আমি শুধু ধূলিকণার মত ভক্তি-বিনত
সত্য ধর্মের কাছে—
(ইস্‌লামের কাছে),
যে ধর্ম বহু পরিচিত পর্বতে প্রান্তরে,
জ্বালিয়ে দেয় যে মানব-হৃদয়ে
অমর-সঙ্গীতের অগ্নি—
সে বপন করেছিল একটি ক্ষুদ্র পরমাণু,
তুলে নিয়ে গেল একটি সূর্য,
ফসল তার শত শত কবি
রুমি-আত্তারের মত।

আমি একটি দীর্ঘশ্বাস :
উত্থান করব আমি আকাশের উচ্চতায় ;
আমি ধূমমাত্র,
তবু উত্থান আমার
জ্বালাময় অগ্নি থেকে।
উচ্চ চিন্তা দ্বারা উর্ধ্বে চালিত হয়ে
লেখনী আমার
প্রকাশ করছে সেই রহস্য,
যা লুক্কায়িত ছিল এই পর্দার অন্তরালে,
যেন একটি বিন্দু হতে পারে
সমুদ্রের সমতুল,
আর বালু-কণা পরিণত হয় সাহারায়।

কাব্য-সৃষ্টি নয় এ মসনভির লক্ষ্য
এর লক্ষ্য নয় সৌন্দর্য-পূজা
আর প্রেম সৃষ্টি।

ভারতবাসী আমি ;
ফারসি নহে আমার মাতৃভাষা ;
অর্ধ চন্দ্রের মত আমি, পিয়ালা নহে আমার পূর্ণ।
চেয়ো না আমার কাছে ভাব-প্রকাশের জাদু,
আশা কর না আমার কাছে
খানাসার ও ইস্‌ফাহান।
যদিও ভারতীয় ভাষা সুমিষ্ট
ইক্ষুর মত,

তবু সুমিষ্টতর ফারসি ভাষার ভঙ্গি।
সৌন্দর্যে তার অন্তর আমার হল আবিষ্ট,
লেখনী আমার হল পল্লবের মত
জ্বলন্ত কুঞ্জের।
আমার চিন্তাধারার ঐশ্বর্যের জন্য
শুধু ফারসিই হল এর বাহন।
ওগো পাঠক,
দোষ দিও না আমার সুরাপাত্র দেখে,
গ্রহণ কর অন্তর দিয়ে
এই সুরার স্বাদ।

প্রথম অধ্যায়

[বিশ্বের গতিধারার মূল উৎস আত্মা। প্রতিটি মানবের জীবনের ধারাবাহিক গতি নির্ভর করে আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলার উপরে।]

অস্তিত্বের রূপ হল আত্মার পরিণাম,
সব কিছুই আত্মার রহস্য—
যা দেখছ তুমি,
জাগ্রত হল যখন আত্মা চৈতন্যে
প্রকাশ করলে সে
চিন্তার বিশ্ব।
নির্যাসে তার শত বিশ্ব লুক্কায়িত :
আত্ম-অনুভূতি আনয়ন করে বে-খুদিকে
প্রকাশ আলোকে।

আত্মা দ্বারা
ধরিত্রীর বুকে রোপিত হয়
বিরোধের বীজ :
অনুভব করে সে তার নিজেকে
অন্যতর রূপে
তার নিজের থেকে।

গঠন করে সে আপনার থেকে
অপরের রূপ
বর্ধন করার জন্য
দ্বন্দ্বের আনন্দ।
এত হত্যা আপনার বাহু-বলে
যেন সে অনুভব করতে পারে
আপনার শক্তি।
তার আত্ম-প্রবঞ্চনা হল
জীবনের নির্যাস ;
সে বেঁচে থাকে রক্ত-ধারায় স্নান করে
গোলাবের মত।

সে ধ্বংস করে শতেক গোলাব–বাগিচা
একটি মাত্র গোলাবের জন্য ;
জাগিয়ে তোলে শতেক আর্ত–বিলাপ
একটি মাত্র সুর সৃষ্টির জন্য।
এক আকাশের জন্য
সে প্রকাশ করে শতেক নবচন্দ্র,
একটি বাণীর জন্য শত শত কথার মালা,
এই অপব্যয় ও নিষ্ঠুরতার কৈফিয়ৎ
রূপ দেওয়া আর পূর্ণ করে তোলা
আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যকে।
শিরির সৌন্দর্য সমর্থন করে
ফর্‌হাদের যাতনা,
একটি মাত্র মৃগনাভি সমর্থন করে
শতেক কস্তুরী–মৃগের মৃত্যু।
পতঙ্গের ভাগ্য
আত্মবিসর্জন করা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে,
তার এ শাস্তি সমর্থন করে প্রদীপ।

আত্মার তুলি
চিত্রিত করে বর্তমানের শতেক দিবসকে
এগিয়ে আনতে ভবিষ্যতের
একটি মাত্র পূর্বাশা।
অগ্নি তার দগ্ধ করেছে শতেক ইব্রাহিমকে
প্রজ্জ্বলিত করতে মুহাম্মদের একটি প্রদীপ।
কর্তা, কর্ম, কার্য, কারণ—
সব কিছুই রূপ সেই কর্মের উদ্দেশ্যের।
আত্মা হয় জাগ্রত, প্রোজ্জ্বল, পতনশীল,
আবার হয় বিভাময়, জীবন্ত,
সে হয় দগ্ধ, আলোময়, চলমান ও উড়ন্ত।
সময়ের বিস্তৃতি তার লীলাক্ষেত্র ;
স্বর্গ তার পথের ধূলি–তরঙ্গ।
তার গোলাব–বাগ থেকে
বিশ্ব হয় গোলাবে ভরপুর ;
রাত্রি জন্ম নেয় তার নিদ্রায়,
দিন জেগে ওঠে তার জাগরণে।
বিভক্ত করেছে সে তার অগ্নিকুণ্ডকে স্ফুলিংগে
আর জ্ঞানকে শিখিয়েছে
বৈশিষ্ট্যের পূজা।

সে ধ্বংস করেছে নিজেকে
আর সৃষ্টি করেছে পরমাণু,
সে বিস্তৃত হয়েছে ক্ষণিকের জন্য
আর সৃষ্টি করেছে বালুকারাশি।
তারপর সে তার ব্যাপ্তিতে হল ক্লান্ত,
আবার একত্রীভূত হয়ে হল
পর্বতমালা।
এই হল আত্মার প্রকৃতি
নিজেকে প্রকাশমান করতে :
প্রতি পরমাণুতে
আত্মার শক্তি রয়েছে তন্দ্রালস।

শক্তি—যা রয়েছে অপ্রকাশ ও নিষ্ক্রিয়
কর্মশক্তিকে করে সুশৃংখল।
বিশ্ব-জীবন যত বেশি করে আসে
আত্মশক্তি থেকে,
জীবন ততই এই শক্তির সাথে রাখে সামঞ্জস্য।
একটি জল-বিন্দু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষা
তার অন্তরে,
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে করে তোলে একটি মুক্তা।

সুরা রূপহীন,
কারণ 'অহম' তার দুর্বল ;
সে তার রূপ পরিগ্রহণ করে
পাত্রের করুণায়।
যদিও সুরাপাত্র গ্রহণ করে রূপ
তবু সে ঋণী আমাদের কাছে
তার গতির জন্য।
পর্বত যখন হারিয়ে ফেলে
তার আপনাকে,
পরিণত হয় সে বালুকায়,
আর অভিযোগ করে যে সমুদ্র স্ফীত হয়ে ওঠে
তার উপরে ;
তরঙ্গ,—যতদিন থাকে সে
সমুদ্র-বক্ষে তরঙ্গ হয়ে,
আরোহী হতে পারে সমুদ্র-পৃষ্ঠে।
আলোক গ্রহণ করলে চক্ষুর রূপ
আর দিগ্বিদিক চলতে লাগল
সৌন্দর্যের সন্ধানে।

তৃণ যখন পেল তার আত্মার ভিতরে
বর্ধনের শক্তি,
তার আকাঙ্ক্ষা বিদীর্ণ করে দিল বাগিচার বুক।
মোমবাতি তার নিজেকে করলে একত্রীভূত
আর গড়ে তুললে তার আপনাকে
পরমাণু থেকে ;
তারপর সে লাগলে গলতে
আর আপনার সত্তা থেকে পলায়ন করতে,
বেয়ে পড়তে লাগলে সে আপনার আঁখি থেকে
অশ্রুর মত।
যদি অঙ্গুরিয়ের প্রস্তরাধার হত
স্বভাবতঃই আত্ম-সংরক্ষিত,
ভোগ করত না সে আঘাত ;
কিন্তু যখন শিরোনামা দ্বারা
হয় তার মূল্য নিরূপিত,
স্কন্ধ তার আহত হয় অন্যের নামের বোঝায়।
যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢ়রূপে স্থিত
তার আপন ভিত্তিতে,
বন্দী চন্দ্র ঘুরে চলে তার চারিদিকে
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।
সূর্যের সত্তা বলিষ্ঠতর
পৃথিবীর চেয়ে
বিশ্ব তাই আপন-ভোলা
সূর্যের আঁখির আলোয়।
রক্তবর্ণ বীচের * রঙের মহিমা
নিবদ্ধ করে আমাদের আঁখিযুগ,
পর্বত হয় ঐশ্বর্যশালী
তার গৌরবে :
পরিচ্ছদ তার অগ্নিতে বোনা,
মূল তার একটি আত্ম-প্রত্যয়শীল বীজের মধ্যে।

জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন-তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্ত্বে।

---

* বীচ—বৃক্ষবিশেষ

দ্বিতীয় অধ্যায়

[আত্মার জীবন সংগৃহীত হয় আদর্শ গঠন আর তাকে জন্ম দেবার ভেতর থেকে]

জীবন সংরক্ষিত হয় উদ্দেশ্য দ্বারা,
কাফেলার বাঁশি বাজে অবিরাম
গন্তব্য পথের সীমানায় পৌঁছবার জন্য।
চাওয়ার মাঝেই মানুষের জীবন,
উৎস–মূল তার লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষার ভিতরে।
আকাঙ্ক্ষাকে রাখ জীবন্ত করে
তোমার অন্তর–তলে,
পাছে তোমার ক্ষুদ্র ধূলিকণা
পরিণত হয়
সমাধি–মৃত্তিকায়।

এই গন্ধ–বর্ণে–ভরা বিশ্বের আত্মাই হল
অন্তরের আকাঙ্ক্ষা,
আকাঙ্ক্ষার বাস–ভূমি
লুক্কায়িত প্রতি পদার্থের প্রকৃতিতে।
আকাঙ্ক্ষা নৃত্যপর করে তোলে
বক্ষোমধ্যে হৃদপিণ্ডকে,

ঔজ্জ্বল্য তার জ্যোতিষ্মান করে তোলে বক্ষকে
দর্পণের মত।
বিশ্বকে সে দান করে শক্তি
ঊর্ধ্বমুখে উত্থানের !
মুসার অনুভূতির কাছে
সে হল খেজ্‌রের মত !
অন্তর আহরণ করে তার জীবন
এই আকাঙ্ক্ষার অগ্নি থেকে,
যখন সে পায় জীবন,
তখনই মৃত্যু হয় সব কিছুর
যা অসত্য।

যখন তার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে
সে হয় বিরত
ভগ্ন হয়ে যায় তার পক্ষ,
করতে পারে না সে উত্থান।
আকাঙ্ক্ষা আত্মাকে রাখে চিরজাগ্রত,
সে হচ্ছে অশান্ত-চঞ্চল তরঙ্গ
আত্মার মহাসমুদ্রে।
আকাঙ্ক্ষা একটি ফাঁদ
আদর্শকে ধরে রাখবার,
কর্মগ্রন্থকে বেঁধে রাখবার যন্ত্র।
আকাঙ্ক্ষার অপলাপ
নির্মম মৃত্যু
জীবন্তের কাছে,
যেমন উত্তাপের অভাব
নির্বাপিত করে অগ্নি-শিখা।

কোথায় আমাদের জাগ্রত চক্ষুর উৎসমুখ?
আমাদের দর্শনের আনন্দ
নিয়েছে দৃশ্যমান রূপ।
তিতির পক্ষীর পদযুগ জন্ম নিয়েছে
তার চলার অপরূপ ভঙ্গি থেকে,
বুলবুলের চঞ্চু তার সঙ্গীতের আনন্দ থেকে।
নল তখনই হয়েছে সুখী,
যখন সে পরিত্যাগ করেছে
তার জন্মভূমি—
নলবন;
তখনই কারামুক্ত হয়েছে তার সঙ্গীত
যা ছিল বন্দী।

সেই অন্তরের অন্তঃসার কী—
যে সন্ধান করে ফেরে নব নব আবিষ্কারকে,
উত্থান করতে চায় ঊর্ধ্বলোকে?
জান তুমি—কোথায় এ রহস্যের কারণ?
সে হল আকাঙ্ক্ষা, যে জীবনকে করে ঐশ্বর্যশালী,
মন তার গর্ভের সন্তান।
সমাজের গঠন, তার রীতি আর
আইন-কানুন কী?
কি এই বিজ্ঞানের অপূর্ব শক্তির রহস্য?

একটি আকাঙ্ক্ষা তার নিজের শক্তিতে
হৃদয়ঙ্গম করেছিল নিজকে,
অন্তর বিদীর্ণ করে বাইরে এসে সে
পরিগ্রহণ করেছিল রূপ।
নাক, হাত, মস্তিষ্ক, চক্ষু এবং কর্ণ,
চিন্তা, কল্পনা, ভাব, স্মৃতি এবং বোধ,—
সব কিছুই অস্ত্র জীবনের আবিষ্কার
আত্ম–সংরক্ষণের জন্য
তার বিরাম–হীন সংগ্রামে।

বিজ্ঞান ও কলার লক্ষ্য নয় জ্ঞান,
বাগিচার লক্ষ্য নয়
কুঁড়ি আর ফুল!
বিজ্ঞান হল একটি যন্ত্র আত্মসংরক্ষণের
বিজ্ঞান একটি পন্থা
আত্মাকে শক্তিশালী করবার।
বিজ্ঞান ও কলা জীবনের ভৃত্য,
যে ভৃত্য জন্ম নিয়েছে ও পালিত হয়েছে
তার আপন গৃহে!

জাগ্রত হও,
ওগো যারা জীবন–রহস্যের কাছে অপরিচিত,
আদর্শের সুরা–রসে প্রমত্ত হয়ে ওঠ জেগে ;
আদর্শ–পূর্বাশার আলোকে সমুজ্জ্বল,
প্রজ্বলিত অগ্নি আল্লাহ্ ব্যতীত সকলের কাছে
যে আদর্শ স্বর্গের চেয়ে উচ্চতর,
যে জয় করবে মুগ্ধ করবে, জাদু করবে
মানুষের আত্মাকে ;
প্রাচীন মিথ্যার যে ধ্বংসকারী ;
যে সংক্ষোভে পরিপূর্ণ,
রোজ কেয়ামতের প্রতিরূপ।

বেঁচে আছি আমরা আদর্শ গঠন দ্বারা,
উজ্জ্বল হয়ে আছি আমরা
আদর্শের সূর্যালোকে।

তৃতীয় অধ্যায়

[আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলে প্রেম]

একটি অতি সূক্ষ্ম আলোক বিন্দুর নাম আত্মা,
সেই হল জীবনালোক
আমাদের ধূলিরাশির ভিতরে।

প্রেম দ্বারা হয় সে অধিকতর স্থায়ী,
অধিকতর জীবন্ত, জ্বলন্ত, প্রোজ্জ্বল।
প্রেম থেকে হয় বিচ্ছুরিত
তার সত্তার আলোক,
সে অজ্ঞাত সম্ভাবনাকে
দেয় পূর্ণতা।
প্রকৃতি তার সংগ্রহে কর অগ্নি প্রেম থেকে,
প্রেম শিক্ষা দেয় তাকে
বিশ্বকে আলোময় করতে।
প্রেম তরবারি এবং খড়্গকে করে না ভয়
আবহাওয়া আর মৃত্তিকা থেকে
নহে তার জন্ম।
প্রেম বিশ্বে আনয়ন করে শান্তি আর সংগ্রাম,
জীবনের উৎস হল প্রেম,
প্রেমই মৃত্যুর ভয়াল কৃপাণ।
কঠিনতর পর্বত হয় প্রকম্পিত প্রেমের ঔজ্জ্বল্যে,
ঐশ্বরিক প্রেম পরিণত হয় পরিপূর্ণ ঈশ্বরে!
শিক্ষা কর প্রেম আর প্রেমাস্পদের সন্ধান :
সন্ধান কর আঁখি নূহের আর
অন্তর আয়ূবের।
তোমার ধূলি–মুষ্টিকে পরিণত কর সুবর্ণে
চুম্বন কর এক পরিপূর্ণ মানবের
প্রবেশ–পথ!

প্রজ্জ্বলিত কর তোমার বাতি
রুমীর মত
আর দগ্ধ কর রুম তাবরিজের অগ্নিতে। *
প্রেমাস্পদ লুক্কায়িত তোমার অন্তরে,
প্রদর্শন করব আমি তাকে তোমার কাছে
যদি থাকে তোমার দর্শনের চক্ষু।
প্রেমিকেরা তাঁর সুন্দরের চাইতে সুন্দরতর,
মধুরতর, সুশ্রীতর, প্রিয়তর।
আত্মা হয় বলশালী তাঁর প্রেমে,
ভূমির স্পন্ধ স্কর্শ করে
সপ্তর্ষিমণ্ডলকে।
নজদের ভূমি হয়েছিল সমুজ্জ্বল
তাঁর গৌরবে,
সে লাভ করল এক মহোল্লাস
আর উত্থান করল আকাশের উচ্চতায়। *
মুসলিমের অন্তঃকরণ মুহাম্মদের আবাস,
যত গৌরব আমাদের,
মুহাম্মদের নাম থেকে।
সিনাই তাঁর গৃহের ধূলিরাশির আবর্ত মাত্র,
বাসভূমি তাঁর কাবার কাছেও তীর্থের মত।
অনন্ত কাল তাঁর সময়ের একটি মুহূর্ত মাত্র,
বর্ধিত হয় এ অনন্ত কালের আয়ু
তাঁর অন্তঃসার থেকে !
ঘুমিয়েছিলেন তিনি তৃণের আস্তরণে,
কিন্তু লুণ্ঠিত হয়েছিল খসরুর রাজ মুকুট
তাঁর অনুগামীদের চরণতলে।
তিনি গ্রহণ করলেন হেরা পর্বতের
নৈশ নিস্তব্ধতা
আর গঠন করলেন একটা রাজ্য, আইন
আর শাসক-মণ্ডলী।

কত রাত্রি তাঁর কেটে গেছে
নিদ্রাহীন চোখে,
যেন ঘুমাতে পারে মুসলিম পারস্য-সিংহাসনে।

---

* এখানে দার্শনিক কবি জালালউদ্দীন রুমির আত্মিক গুরু শাম্‌স্-ই-তাব্‌রিজকে বোঝানো হয়েছে।

* নজদ— আরবের উচ্চভূমি। বহু রোমাঞ্চকর প্রেমের কাহিনী এ দেশের সঙ্গে বিজড়িত। লায়লা মজনুর প্রেমকাহিনী বিশ্ববাসীর কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে লৌহ যেত গলে
তাঁর তরবারির চমকে,
আর নামাজের সময়ে অশ্রু ঝরত তাঁর চোখে
বৃষ্টিধারার মত
প্রার্থনা করতেন যখন তিনি আল্লার সাহায্য,
তরবারি তার জওয়াব দিত—'আমীন',
আর ধসে যেত কত রাজবংশ।
আনলেন তিনি নবতর কানুন এই বিশ্বে।

প্রাচীন সাম্রাজ্যরাজিকে আনলেন তিনি
সমাপ্তির দিকে।
দ্বার উদঘাটন করলেন তিনি নবীন বিশ্বের
ধর্মের কুঞ্জিকা দ্বারা :
বিশ্ব-গর্ভে কোনোদিন জন্ম নেয় নি
তাঁর মত মহামানুষ।
দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চনীচ ছিল সমান,
বসতেন তিনি আহারে তাঁর ভৃত্যের সাথে
এক বিছানায়।

তায়ী আমীর-কন্যা * হল বন্দী
সমর-ক্ষেত্রে
আর আনীত হল মহাপুরুষের সম্মুখে
চরণ যুগল তার শৃংখলাবদ্ধ, দেহ অনাবৃত,
লজ্জায় শির অবনত।
মহান নবী যখন দেখলেন তাকে অনাবৃত,
ঢেকে দিলেন তার মুখমণ্ডল
আপনার আচ্ছাদন দ্বারা।

আমরা অধিকতর উলঙ্গ
তায়ী আমীর-কুমারীর চেয়ে,
অনাবৃত আমরা বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে।
ঈমান আমাদের তাঁরই উপর
রোজ কেয়ামতের দিনে,
এই বিশ্বেও শুধু তিনি আমাদের রক্ষক।
তাঁর অনুগ্রহ আর গজব
উভয়ই হচ্ছে করুণা :

---

* আতিথ্য-পরায়ণ হাতেম তায়ীর কন্যা।

একটা হচ্ছে করুণা বন্ধুদের উপর,
অপর শত্রুর প্রতি।
খুলেছিলেন তিনি করুণার দ্বার
দুশ্‌মনের কাছে,
মক্কায় প্রচার করেছিলেন বাণী :
"কোনো প্রতিশোধ নেওয়া হবে না
তোমাদের উপর।"

আমরা যারা জানি না দেশের বন্ধন
আছি দৃষ্টির মত এক
যদিও আলোক আসে তাঁর দুচোখ থেকে
বাস করি আমরা হেজাজ, চীন ও পারস্যে :
তবু আমরা শিশির-বিন্দুচয়
এক হাস্যোজ্জ্বল ঊষার।

মেনে চলি আমরা নির্দেশ সেই মক্কার সাকীর
একীভূত আমরা সুরারস আর পিয়ালার মত।
দগ্ধ করেছিলেন তিনি নির্মম দাহনে
যত আভিজাত্যের বিভেদ
অগ্নি তাঁর গ্রাস করেছিল যত মিথ্যা আর জঞ্জাল।
অসংখ্য দলবিশিষ্ট আমরা
গোলাবের মত
কিন্তু খোশবু তার এক।

আত্মা তিনি এই সমাজের
অদ্বিতীয় তিনি!
আমরা ছিলাম তাঁর অন্তরের গোপন রহস্য :
বাণী প্রচার করলেন তিনি নির্ভয়ে,
আর আমরা হলাম অবতীর্ণ।
তার প্রেমের গীতি পরিপূর্ণ করেছে আমার নিঃশব্দ বংশী,
বক্ষে আমার আছড়ে পড়ে
শতেক সঙ্গীত-সুর।

কি করে বলব আমি
কি প্রেম জাগ্রত করেছিলেন তিনি?
শুষ্ক কাষ্ঠরাশি ক্রন্দন করেছিল
তাঁর বিদায়ে।

গৌরব তাঁর প্রকাশ লাভ করে
মুসলিমের সত্তায়।
কত সিনাই জাগ্রত হয়
তার পথের ধূলা থেকে।

আমার মূর্তি জন্ম নিয়েছিল
তাঁর দর্পণে,
আমার ঊষা জেগে উঠেছিল
তাঁর বক্ষের সূর্য থেকে।
বিশ্রাম আমার অশান্ত-চঞ্চল,
গোধূলি আমার উষ্ণতর
রোজ-কিয়ামতের প্রভাতের চেয়ে,
বসন্ত-মেঘ তিনি, আর আমি তাঁর বাগিচা,
আঙুর-কুঞ্জ আমার শিশির-সিক্ত হয়
তাঁর বর্ষণে।

আমি বপন করেছিলাম আমার আঁখি
প্রেমের ক্ষেত্রে,
আর তুলে নিয়েছি কল্পনার ফসল।
"মদীনা-ভূমি মিষ্টতর উভয় বিশ্বের চেয়ে,
আহা, সুখময় সেই নগরী
যেখানে আবাস সেই প্রেমাষ্পদের।"
মোল্লা জামীর বর্ণনা-ভঙ্গিতে
আত্মহারা আমি ;
তাঁর কাব্য ও সাহিত্য আমার অপূর্ণতার প্রতিষেধক।
তিনি লিখেছিলেন কাব্য
অপরূপ ধারায়
আর গেঁথেছিলেন মুক্তা-মালা
প্রভুর গুণ কীর্তনের,
"মুহাম্মদ হচ্ছেন ভূমিকা বিশ্ব-গ্রন্থের ;
সারা বিশ্ব হচ্ছে দাস আর তিনি তার প্রভু।"

প্রেমের সুরারস থেকে জন্ম নেয়
কত আধ্যাত্মিক গুণরাজি :

অন্ধ অনুরাগ হচ্ছে প্রেমের অন্যতম লক্ষণ।
বোস্তামের ঋষি বায়েজিদ,
যিনি ভক্তিতে ছিলেন অদ্বিতীয়,
পরিত্যাগ করেছিলেন তরমুজ। *
আশেক হও অনুক্ষণ তোমার মাশুকের অনুরাগে,
যেন তুমি সঞ্চালন করতে পার পক্ষ
পৌঁছতে আল্লার নৈকট্যে
পরিভ্রমণ কর মুহূর্তের জন্য
অন্তরের হেরা প্রদেশে,
পরিত্যাগ কর নিজকে, ছুটে যাও আল্লার পথে।
বলশালী হয়ে আল্লাহ্ দ্বারা
প্রত্যাবর্তন কর আত্মার দিকে,
ভেঙে দাও ইন্দ্রিয়পরতার লাত ও ওজ্জার মস্তক।
চালনা কর এক বাহিনী
প্রেমের শক্তিতে,
অবতীর্ণ কর তোমার আপনাকে
প্রেমের ফারান্ পর্বতে ;
যেন কাবার প্রভু প্রদর্শন করেন
তোমায় অনুগ্রহ—
আর গড়ে তোলেন তোমায় এই বাণীর প্রতিমূর্তি করে,
"ওগো, প্রেরণ করব এক প্রতিনিধি
বিশ্বের বুকে।" *

---

* বায়েজিদ বোস্তামি (রাঃ) তরমুজ খেতে অস্বীকার করেছিলেন, কেননা মহানবী মুহাম্মদ (দঃ) তরমুজ কোনোদিন খান নি।

* কোরান।

চতুর্থ অধ্যায়

[আত্মা দুর্বল হয়ে পড়ে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা]

ওগো যারা কর গ্রহণ করতে সিংহের কাছ থেকে,
তোমাদের প্রয়োজন
তোমাদেরকে পরিণত করেছে শৃগালে।
বেদনা–সঙ্গীত তোমার দারিদ্র্যের ফল :
এই ব্যাধি তোমার ব্যথার উৎসমুখ।
তাতে বিনষ্ট করে তোমাদের সম্মানের উচ্চ ধারণা,
আর নিভিয়ে দেয় তোমাদের
মহান কল্পনার আলোক।

পান কর গোলাবী সুরারস
অস্তিত্বের সোরাহী থেকে !
ছিনিয়ে নাও কালের ভাণ্ডার থেকে অর্থ !
নেমে এস উষ্ট্র–পৃষ্ঠ থেকে
ওমরের মত !
সাবধান, ঋণী হয়ো না কারুর কাছে ?
আর কতকাল তুমি আকাঙ্ক্ষা করবে দাসত্ব
আর চাইবে শিশুর মত আরোহণ করতে
নলের উপর ?

যে প্রকৃতি নিবদ্ধ রাখে তার দৃষ্টি আকাশের দিকে,
হয়ে পড়ে হীনতর
দান গ্রহণের দ্বারা।
দারিদ্র্য গ্রহণ করে উৎকট আকার
ভিক্ষাবৃত্তিতে ;
ভিক্ষায় ভিক্ষুককে করে তোলে দরিদ্রতর।
ভিক্ষা অবনমিত করে আত্মাকে
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে
আলোক থেকে।

ছড়িয়ে দিও না তোমার ধূলিমুষ্টিকে,
সংগ্রহ কর অন্ন তোমার আত্মশক্তিবলে
চন্দ্রের মত !

যদিও দরিদ্র হতভাগ্য তুমি
আর অভাবের যাতনায় বিচঞ্চল,
তবু কামনা কোর না তোমার দিনের অন্ন
অপরের অনুগ্রহ থেকে,
চেয়ো না জল সূর্যের ঝর্ণা থেকে,
পাছে তুমি পতিত হও লজ্জায়
মহানবীর সম্মুখে
রোজকিয়ামতের দিনে,
যেদিন প্রত্যেক আত্মা হবে ভয়ে প্রকম্পিত।
চন্দ্র সংগ্রহ করে তার উপজীবিকা
সূর্যের ভাণ্ডার থেকে
আর বহন করে তার অনুগ্রহের দাগ
আপনার বুকে।
প্রার্থনা কর সাহস আল্লার দরবারে !
দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর সৌভাগ্যের সাথে !
পবিত্র ধর্মের গৌরবকে কর না ক্ষুণ্ণ !
যিনি মূর্তির আবর্জনা দূর করেছিলেন কাবা থেকে,
বলেছিলেন : আল্লাহ্ প্রেম করেন সেই লোককে,
যে উপার্জন করে তার আপন জীবিকা।
ধিক তাকে যে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে
অপরের কাছে,
অবনত করে তার শির অন্যের করুণায় !

গ্রাস করেছে সে তার আপনাকে
অপরের প্রদত্ত অনুগ্রহের অগ্নিতে,
আত্মসম্মান বিক্রয় করেছে সে
এক কপর্দকের বিনিময়ে।
সুখী সে,
যে রৌদ্রতাপ–দগ্ধ হয়েও খেজুরের কাছে কামনা করে না
এক পিয়ালা আবে–হায়াত !
ভিক্ষাবৃত্তির লজ্জায় ভ্রূযুগ নহে তার সিক্ত :
তখনো সে পূর্ণ মানুষ,
শুধু মৃত্তিকা–খণ্ড নহে।

সেই মহান তারুণ্য বিচরণ করে আকাশের নিচে
মাথা উঁচু করে
পাইন বৃক্ষের মত।
হস্ত তার রিক্ত?
সে-ই সব চাইতে বেশি প্রভুত্ব-সম্পন্ন
আত্মার উপর।
হ্রাসপ্রাপ্ত হয় তার ঐশ্বর্য?
অধিকতর সাবধান সে।

ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যদি অর্জন কর
একটি মহাসমুদ্র,
তা শুধু অনল সমুদ্রই;
মধুরতর একটি ক্ষুদ্র শিশির-বিন্দু—
যদি অর্জিত হয় স্বহস্তে।
সম্মানিত মানুষ হও,
জলবুদ্বুদের মত
রাখ তোমার পিয়ালা উল্‌টে
সমুদ্রের মাঝেও।

পঞ্চম অধ্যায়

[আত্মা যখন শক্তি সংগ্রহ করে প্রেম থেকে, সে প্রভুত্ব করতে পারে বিশ্বের ভিতর ও বাইরের সব শক্তির উপরে।]

যখন আত্মাকে বলশালী করে তোলা যায়
প্রেম দ্বারা,
শক্তি তার শাসন করে বিরাট বিশ্ব।

সেই স্বর্গীয় ঋষি যিনি সাজিয়েছিলেন আকাশকে,
তারার মালায়
আহরণ করেছিলেন এই সব কুঁড়ি
আত্মার শাখা থেকে।
হস্ত তার হয়ে ওঠে ঐশী হস্ত,
অঙুলি-ইশারায় তাঁর দ্বিখণ্ডিত হয় চন্দ্র।
শান্তি-স্থাপনকারী সে এ বিশ্বের সকল বিরোধের মাঝে,
আজ্ঞা তার পালন করে
জামশিদ ও ডারিয়াস্।
আমি বলব তোমায় বু-আলীর কাহিনী, *
নাম যাঁর বহুবিখ্যাত
সারা ভারতের বুকে ;
প্রাচীন গোলাব-বাগিচার সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন যিনি,
বলেছিলেন যিনি মুগ্ধকর গোলাবের কাহিনী।
তাঁর চঞ্চল খির্কার হাওয়ায়।
গড়েছিলেন তিনি ফিরদাউস্
এই অনলোদ্ভূত দেশে !

একদিন তরুণ শিষ্য তাঁর চলেছে বাজারের পথে,
বু-আলীর বাণীর সুরারসে
প্রমত্ত তার শির।

* পানিপথের শেখ শরাফুদ্দীন। বু-আলী কলন্দর নামে তিনি সবিশেষ পরিচিত। ১৩২৫ খৃস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

নগরের শাসনকর্তা চলেছে পথে
অশ্বপৃষ্ঠে,
চারিপাশে তার ভৃত্য ও অনুচরবৃন্দ।
পূরোবর্তী অনুচর বললে চীৎকার করে :
"ওগো বে-খেয়াল পথিকদল,
এস না কেউ শাসনকর্তার চলার পথে !"
দরবেশ তখন করছে পাদবিক্ষেপ
অবনত মস্তকে,
নিমজ্জমান তার আপন চিন্তার সমুদ্রে।
অহংকার-মত্ত দণ্ডবাহক
ভেঙে দিলে তার দণ্ড দরবেশের মস্তকে,
আর দরবেশ ছেড়ে চললে শাসনকর্তার পথ,
বিমর্ষ, দুঃখপীড়িত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

হাজির হল সে বু-আলীর কাছে,
জানালে তাঁর কাছে অভিযোগ,
ঝরে পড়ল অশ্রুধারা তাঁর আঁখিযুগ থেকে।
শেখের মুখ থেকে বেরিয়ে এল
অগ্নিময় বাণী
পর্বতোপরি বিদ্যুৎ-চমকের মত।

আত্মা তাঁর উদ্গীরণ করলে এক অদ্ভুত অনল-জ্বালা,
আদেশ করলেন তিনি তাঁর অনুচরকে :
লেখনী ধারণ করে লিখে দাও একপত্র
সুলতানের কাছে দরবেশের কাছ থেকে।
বল,—'তোমার শাসনকর্তা ভেঙেছে
আমার সেবকের শির ;
নিক্ষেপ করেছে সে জ্বলন্ত অনল
তার আপনার জীবনে।

গেরেফতার কর এই দুর্মতি শাসককে,
নতুবা প্রদান করব আমি তোমার রাজ্য
অপরের হাতে।'
আল্লাহ্ প্রিয় দরবেশের পত্র
সুলতানের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ করলে
প্রকম্পিত।

দেহ তার পরিপূর্ণ হল জ্বালায়,
হলেন তিনি বিমর্ষ-ম্লান
সন্ধ্যা-রবির মত।
প্রেরণ করলেন তিনি হাত-কড়ি,
সেই শাসনকর্তার জন্য,
আর অনুরোধ করলেন বু-আলীকে
ক্ষমা করতে এই গোস্তাখী।

খোশ্-এলহান কবি খস্রু—
সুর যাঁর উত্থিত হত
সৃষ্টি-প্রতিভাশালী অন্তর থেকে,
আর যাঁর প্রতিভা ছিল চন্দ্রালোকের মৃদু ঔজ্জ্বল্যে পরিপূর্ণ,
নিযুক্ত হলেন রাজদূত।
হাজির হলেন যখন তিনি বু-আলীর সম্মুখে
আর বাজালেন তাঁর বীণা,
তাঁর সঙ্গীত বিগলিত করল ফকিরের অন্তর
কাচের মত।
কাব্যের একটি মাত্র সুরের রেশ
বয়ে আনল একটা রাজত্বের মহিমা,
যা ছিল পর্বতের মত স্থির।
দরবেশদের অন্তর কর না আহত,
নিক্ষেপ কর না তোমার নিজকে
জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[একটি কাহিনী। এর সারমর্ম হচ্ছে—আত্মঅস্বীকারের মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল মানবের শাসিত সম্প্রদায়ের দ্বারা। উদ্দেশ্য ছিল—তাদের শাসক সম্প্রদায়ের স্বভাবে দুর্বলতা আনয়ন করা।]

শুনেছ তোমরা সেই প্রাচীনকালের কথা?
এক দল মেষ থাকত কোনো চারণভূমিতে,
বর্ধিত হয়েছিল তারা সংখ্যায়,
ভয় ছিল না তাদের দুশ্‌মনের জন্য।
ভাগ্যের বিড়ম্বনা,
বক্ষ তাদের বিদীর্ণ হল
দুর্যোগের আঘাতে।
বন থেকে এল একদল ব্যাঘ্র,
ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা
মেষ-পালের উপরে।

দেশজয় আর অধিকার স্থাপন শক্তির নিদর্শন,
বিজয় হল প্রকাশ
সেই শক্তির।
প্রভুত্বের ভেরী বাজাল হিংস্র ব্যাঘ্রের দল,
বঞ্চিত করল তারা মেষদলকে
তাদের স্বাধীনতা থেকে।
ব্যাঘ্রেরা যত সংগ্রহ করতে লাগল তাদের শিকার,
ময়দান তত রক্তিম হতে লাগল
মেষের শোণিতে।
একটি মেষ,—
চালাক এবং সুচতুর সে,
বয়োবৃদ্ধ, ধূর্ত—
নেকড়ের মত;
জ্ঞাতি বন্ধুদের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হল সে,
বিরক্ত হল ব্যাঘ্রদের নির্মমতায়,
অভিযোগ করল সে অদৃষ্টচক্রের জন্য,

ফিরিয়ে আনতে চাইল কৌশলে
তার জাতির সৌভাগ্য।

দুর্বল যারা,
তারা আত্মসংরক্ষণের জন্য
উপায় উদ্ভাবন করে
সুনিপুণ বুদ্ধি দ্বারা।
দাসত্বের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবার জন্য
উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা হয় দ্রুত,
আর যখন প্রতিশোধের উন্মত্ততা
হয়ে উঠে প্রকট ;
দাসত্ব-পীড়িতের মন তখন
চিন্তা করে বিদ্রোহের।
"বন্ধন আমাদের দুশ্ছেদ্য,"—
বললে সে আপন মনে,
"কিনারা নেই আমাদের দুঃখ-সমুদ্রের।
শক্তিতে পারি না আমরা রক্ষা পেতে
ব্যাঘ্রের হস্ত থেকে :
পদযুগ আমাদের রজত-সম ;
নখর তাহার লৌহের সমতুল।
সম্ভব নহে তা কিছুতেই,
যতই চলুক উপদেশ আর মন্ত্রণা,
অসম্ভব সৃষ্টি করা নেকড়ের স্বভাব
মেষের ভিতরে।
কিন্তু সেই হিংস্র ব্যাঘ্রকে মেষে পরিণত করা—
তা হবে সম্ভব ;
উদাসীন করা তাকে তার স্বভাবে—
তাও সম্ভব হবে।"
সে সাজল পয়গাম্বর
প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত,
প্রচার করতে লাগল সে
রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের কাছে।
বললে সে চীৎকার করে :
"ওগো উদ্ধত মিথ্যাবাদীর দল,
যারা চিন্তা কর না সেই দুর্ভাগ্যের দিন
যা হবে চিরন্তন !
অধিকারী আমি ঐশী শক্তির,
নবী আমি আল্লার প্রেরিত
ব্যাঘ্রদের জন্য।

আমি এসেছি আলোক হয়ে
অন্ধ আঁখির জন্য,
এসেছি আমি আইন স্থাপন করতে
আর জারী করতে আদেশ।
অনুতপ্ত হও তোমাদের নিন্দনীয় কার্যের জন্য!
ওগো দুষ্ট ষড়যন্ত্রকারীর দল,
মনোযোগী হও নিজকে সৎপথে পরিচালিত করতে!
হিংস্র এবং শক্তিশালী যে,
শোচনীয় তার অবস্থা :
জীবনের সাফল্য আত্ম-অস্বীকারে।
ধর্মের সার তৃণভোজনে :
তোমাদের দন্তের তীক্ষ্ণতা আনে অমর্যাদা
তোমাদের জীবনে ;
করে তোমাদের অনুভূতির আঁখিকে অন্ধ।

শুধু দুর্বলের জন্যই আছে ফিরদাউস্,
শক্তিই হল ধ্বংসের পন্থা।
বৃহত্ত্ব এবং সম্মানের লোভই হল দুর্মতি,
দারিদ্র্য মিষ্টতর রাজত্বের চেয়ে ;
বিদ্যুৎ-চমকের ভয় রাখে না শস্যবীজ ;
বীজ যদি হয়ে পড়ে রাশিকৃত,
নির্বোধ সে।
যদি তুমি হও সচেতন,
তুমি হবে বালু-মুষ্টি, সাহারা নয়,
যেন তুমি উপভোগ করতে পার
সূর্য-রশ্মি।
ওগো, যারা আনন্দ পাও মেষ-হত্যায়,
হত্যা কর নিজেকে,
যেন তুমি পেতে পার সম্মান!
জীবন হয়ে যায় অস্তিত্বহীন
হিংসা, অত্যাচার, প্রতিহিংসা
আর শক্তি প্রদর্শন দ্বারা।
যদিও পদদলিত,
তবু তৃণ জেগে ওঠে অনন্তকাল ধরে
আর ধুয়ে দেয় মৃত্যুর নিদ্রা
তার আঁখি থেকে
বারংবার।

ভুলে যাও আপনাকে,
যদি তুমি হও জ্ঞানী !
যদি তুমি বিস্মৃত না হও আপনাকে,
উন্মাদ তুমি।
নিমিলিত কর তোমার আঁখি,
বন্ধ কর তোমার কর্ণ, বন্ধ কর তোমার মুখ,
যেন তোমার চিন্তাধারা উত্থিত হয়
আকাশের উচ্চতায় !
পৃথিবীর এই বিস্তৃত বিচরণ-ক্ষেত্র
কিছু নয়, কিছু নয়,—
ওগো নির্বোধ, উৎপীড়িত কর না নিজেকে
একটা অপচ্ছায়ার জন্য !"

ব্যাঘ্রজাতির ক্লান্তি এসেছিল
কঠোর দ্বন্দ্বে,
তারা ভাসিয়ে দিয়েছিল আপনাদেরকে
বিলাসের আনন্দে।
এই নিদ্রাকর উপদেশ-বাণী
তুষ্ট করল তাদেরকে,
নির্বুদ্ধিতায় তারা গ্রাস করল
মেষের জাদু।
যারা শিকার করত মেষ,
এবার গ্রহণ করল মেষের ধর্ম।
ব্যাঘ্রজাতি শুরু করল তৃণাহার :
অবশেষে ভেঙে গেল তাদের
ব্যাঘ্রের প্রকৃতি।
তৃণ ভোজন ভোঁতা করে দিল তাদের দন্ত,
নির্বাপিত করল তাদের চোখের ঔজ্জ্বল্য,
সাহস অন্তর্হিত হল ক্রমে তাদের বক্ষ থেকে,
আলোক দূর হল
দর্পণ থেকে।
থাকল না তাদের অতি পরিশ্রমের প্রমত্ততা,
কর্মের আকাঙ্ক্ষা আর থাকল না
তাদের অন্তরে।
হারিয়ে ফেলল তারা
শাসন-ক্ষমতা আর স্বাধীনতার সংকল্প ;
হারাল তারা খ্যাতি, সম্মান আর সৌভাগ্য।

তাদের নখর—যা ছিল লৌহ-সমতুল—
হল শক্তিহীন ;
তাদের আত্মার হল মৃত্যু
আর দেহ হল তাদের সমাধি-মৃত্তিকা।
দৈহিক শক্তি হল হ্রাস,
যখন আধ্যাত্মিক ভয় হল বর্ধিত :
আধ্যাত্মিক ভয় হরণ করল তাদের সাহস।

সাহসের অভাব জন্মাল শতেক ব্যাধি—
দারিদ্র্য, ভীরুতা, নীচবৃত্তি।
জাগ্রত ব্যাঘ্র মেষের জাদুতে হল
তন্দ্রাভিভূত,
এই অধঃপতনেরই নামকরণ করলে সে
নৈতিক শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়

[প্লেটো—যাঁর চিন্তাধারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে ইসলামের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা ও সাহিত্যকে—মেনে চলতেন মেষের ধর্ম। আমাদেরকে আত্মসংরক্ষণ করতে হবে তাঁর প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে।]*

প্লেটো—সংসার-বিরাগী ঋষিশ্রেষ্ঠ,
ছিলেন সেই প্রাচীন মেষপালের অন্যতম !
তাঁর পেগেসাস্ পথ হারিয়েছিল
ভাববাদিতার অন্ধকারে ;
আর পাদুকা নিক্ষেপ করেছিল
বাস্তবের গিরিশিখরে।
অদৃশ্য করেছিল তাঁকে মায়ামুগ্ধ,
হস্ত, চক্ষু, কর্ণের ছিল না কোনো গুরুত্ব
তাঁর কাছে।
"মৃত্যু"—তিনি বলতেন,—"জীবনের গোপন রহস্য ;
প্রদীপ গৌরবান্বিত হয় নির্বাপিত হয়ে।"
তিনি দুর্বল করে দিয়েছেন আমাদের চিন্তাধারা,
পিয়ালা তাঁর নিদ্রাভিভূত করে আমাদেরকে
আর সরিয়ে নেয় আমাদের কাছ থেকে
দৃশ্যমান বিশ্ব।
তিনি একটি মেষ মানব-পরিচ্ছদে,
সুফির আত্মা অবনমিত হয়
তাঁর প্রভাবের কাছে।

---

* প্লেটোর দর্শন দৃশ্যত মুসলিম চিন্তাধারাকে অতি অল্পই প্রভাবান্বিত করেছিল। মুসলিম পণ্ডিতেরা যখন গ্রিক দর্শন পড়তে শুরু করলেন, তখন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল আরাস্তুর দিকে। তাঁরা আরাস্তুর খাঁটি রচনাগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তার নামে যে সব দর্শনের অনুবাদ প্রচলিত ছিল সেগুলিকেই তাঁরা আরাস্তুর দর্শন বলে বিশ্বাস করতেন। বাস্তবিকপক্ষে, সেগুলি ছিল প্লাটিনাস, প্রোক্লাস্ এবং পরবর্তী নিউ প্লেটোনিক দর্শনবাদীদের রচনা। কাজেই অদৃশ্যভাবে প্লেটোর দর্শন গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল ইসলামী চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মবাদকে। প্লেটোকে মুসলিম আধ্যাত্মবাদের জনক না বললেও ইসলামী চিন্তাধারার একজন প্রভাবশালী অধিনায়ক বলা যেতে পারে।

উচ্চ চিন্তাধারা নিয়ে তিনি উত্থিত হয়েছিলেন
উচ্চতম আকাশ-লোকে
আর বলতেন এই প্রকৃতির বিশ্বকে
একটি উপকথা।
কাজ ছিল তার ভেঙে দেওয়া জীবনের প্রাসাদ
আর খণ্ডিত করা জীবন বৃক্ষের
শাখা-সমূহ।
প্লেটোর চিন্তাধারা ক্ষতিকে মনে করত লাভ ;
দর্শন তাঁর সত্তাকে প্রচার করেছিল
অসত্তা বলে।
প্রকৃতি তার এনেছিল তন্দ্রা
আর সৃষ্টি করেছিল স্বপ্ন
অন্তশ্চক্ষু তাঁর সৃষ্টি করেছিল মৃগতৃষ্ণিকা।
ছিল না তাঁর কর্ম-স্পৃহা,
আত্মা তাঁর আনন্দ লাভ করত
অনস্তিত্বকে নিয়ে।
তিনি অবিশ্বাস করতেন এই বাস্তব বিশ্বকে,
হয়েছিলেন স্রষ্টা অদৃশ্য কল্পনারাজির।

মধুর এই দৃশ্যমান জগত
জীবন্ত আত্মার কাছে,
প্রিয় সেই কল্প-জগৎ মৃত আত্মার কাছে ;
তাঁর মৃগের নেই মহিমা চলার গতিভংগীর,
তিতির তাঁর পায় না বিলাস-ভ্রমণের আনন্দ।
তাঁর শিশির-বিন্দুরা পারে না দুলতে,
তাঁর পাখিদের বক্ষে নেই শ্বাস-প্রশ্বাস,
বীজ তাঁর চায় না বর্ধিত হতে।
পতংগ তাঁর জানে না পক্ষ সঞ্চালন করতে।
সন্ন্যাসীর আমাদের পলায়ন ছাড়া ছিল না উপায় ;
বিশ্বের কল-কোলাহল
পারতেন না তিনি সহ্য করতে।
তিনি তাঁর আত্মাকে স্থাপন করেছিলেন
নির্বাপিত অনল-কণায়,
আর অংকিত করেছিলেন একটি বিশ্ব
অহিফেন-তন্দ্রাভিভূত।
তিনি পক্ষ বিস্তার করেছিলেন আকাশের উদ্দেশে,
আর ফিরে এলেন না তাঁর নীড়ে।

কল্পনা তাঁর নিমজ্জিত ছিল স্বর্গের সোরাহীতে,
জানি না তা সেই সুরাপাত্রের ময়লা,
না তার নীচের ইষ্টক।
মানব-জাতি বিষদুষ্ট হয়েছিল
তাঁর নেশায় :
তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর,
আনন্দ পেতেন না কোনো কর্মে।

অষ্টম অধ্যায়

[কাব্যের সত্যিকার প্রকৃতি ও ইসলামী সাহিত্যের সংস্কার সম্বন্ধে]

আকাঙ্ক্ষা মানব-দেহে প্রবাহিত করে উত্তপ্ত শোণিত,
আকাঙ্ক্ষার প্রদীপে প্রজ্বলিত হয়
এই ধূলি-কণা।
আকাঙ্ক্ষা দ্বারা জীবনের পিয়ালা পূর্ণ হয়
সুরা-রসে কানায় কানায়,
যেন জীবন চঞ্চল হয়ে উঠে,
চলমান হয়ে উঠে চপল গতিতে।
জীবন পূর্ণ হয়ে উঠে শুধু বিজয়ে,
আর বিজয়ের আকর্ষণ হল আকাঙ্ক্ষায়।
জীবন হল শিকারী আর আকাঙ্ক্ষা তাঁর ফাঁদ,
আকাঙ্ক্ষা প্রেমের সুসংবাদ
সুন্দরের কাছে।

কী কারণে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে
জীবন-গীতির সঙ্গীত-রাগ?
যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু মনোরম, যা কিছু সুন্দর,
তাই আমাদের পথ-প্রদর্শক
অকাঙ্খার গহন অরণ্যে।
মূর্তি তার অংকিত হয় তোমার অন্তরে,
সৃষ্টি করে তোলে আকাঙ্ক্ষা
তোমার অন্তর-তলে।
সুন্দর হল আকাঙ্ক্ষার ভরা জোয়ারের স্রষ্টা,
আকাঙ্ক্ষা লালিত হয়।
সৌন্দর্য-প্রকাশে।
সৌন্দর্য অবগুণ্ঠন-মুক্ত হয় কবির অন্তরে,
সৌন্দর্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়
তার সিনাই থেকে।
দৃষ্টিতে তার সুন্দর হয়ে উঠে সুন্দরতর,

প্রকৃতি প্রিয়তর হয়
তার জাদুতে।

বুল্‌বুল্‌ শিখেছে তার সঙ্গীত তার মুখ থেকে,
রঙে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে
গোলাবের গণ্ডদেশ।
অনুরাগ তার দগ্ধ করে পতংগের অন্তর,
সে-ই তো লাগিয়ে দেয় উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা
প্রেম-কাহিনীতে।
সমুদ্র ও পৃথিবী আছে লুক্কায়িত
তার জল ও কর্দমে, *
শতেক নবীন বিশ্ব আছে লুক্কায়িত তার অন্তরে।
যখন প্রস্ফুটিত হয় নি তার মস্তিষ্কে কুসুম-রাজি,
শ্রুত হয় নি কোনো আনন্দ বা ব্যথার সঙ্গীত।
সঙ্গীত তার এনে দেয় এক অপূর্ব সম্মোহন
আমাদের উপর,
লেখনী তার টেনে আনে পর্বতকে একটি মাত্র চুলের সাথে।
চিন্তাধারা তার বিরাজ করে
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজির সাথে,
সে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য আর জানে না
কুৎসিত কী।
সে একজন খেজ্‌র,*
অন্ধকারের ভেতরে আছে তার
আবে-হায়াত :
অশ্রুতে তার আরো জীবন্ত করে তোলে
অস্তিত্বশীল পদার্থকে।
ধীর পদক্ষেপে চলি আমরা অনভিজ্ঞ নবিসের মত,
হোঁচট খেতে খেতে গন্তব্য পথের উপর।
বুল্‌বুল্‌ তার বাজিয়েছে একটি সুর
আর পেতেছে মন্ত্রণাজাল আমাদেরকে প্রতারিত করতে
যেন সে চালিত করতে পারে আমাদেরকে
জীবনের ফির্‌দাউস্‌-ভূমিতে,
আর যেন জীবনের ধনুক হতে পারে
একটি পূর্ণ চক্র।

* জল ও কর্দম এখানে মানবদেহ বুঝায়।
* কথিত আছে, হযরত খেজ্‌র (আঃ) অন্ধকার ভূমিতে 'আবে-হায়াতে'র সন্ধান পেয়েছিলেন।

কাফেলা অগ্রসর হয় তার ঘন্টাধ্বনিতে
আর অনুসরণ করে তার বংশীর আওয়াজ,
যখন তার মন্দবায়ু প্রবাহিত হয় আমাদের বাগিচার উপর দিয়ে
প্রবিষ্ট হয় তা গুল্ম ও গোলাবরাজির বুকে
ধীরে সন্তর্পণে।
তার জাদুমন্ত্র জীবনকে করে তোলে আত্ম-বর্ধিষ্ণু,
সে হয়ে উঠে আত্মজিজ্ঞাসু ও চঞ্চল।
সে সারা বিশ্বকে করে নিমন্ত্রণ
তার জিয়াফতে ;
সে অপব্যয় করে তার অগ্নি,
যেন তা সুলভ বাতাসের মত।
ধিক সেই সব জাতিকে,
যারা আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুর কাছে,
আর যাদের কবি তাদেরকে সরিয়ে নেয়
জীবনের আনন্দ থেকে।
দর্পণ তার প্রকাশ করে সৌন্দর্যকে
কুৎসিতরূপে,
মকরন্দ তার দিয়ে যায় শতেক দংশন
অন্তরের মাঝে।
চুম্বন তার বিনষ্ট করে গোলাবের সজীবতা,
বুলবুলের অন্তর থেকে সে ছিনিয়ে নেয়
উড়ে বেড়ানোর আনন্দ।
স্নায়ু তোমার দুর্বল হয়ে আসে
তার অহিফেন নেশায় ;
তোমার জীবনের বিনিময়ে
দাও তুমি তার সঙ্গীতের মূল্য।
সে আনন্দের সাইপ্রেস্ বৃক্ষকে করে
সৌন্দর্য-বঞ্চিত,
শীতল নিশ্বাস তার শিকারে পরিণত করে
শ্যেনপক্ষীকে।
মৎস্য সে,
বক্ষ থেকে উপর তার মানবাকৃতি,
সমুদ্র বিলাসিনী নারীর মত।
সঙ্গীতে সে জাদু করে নাবিককে,
আর টেনে নেয় তরণী
সমুদ্রের তলদেশে।
দুঃখ-সঙ্গীত তার হরণ করে দৃঢ়তা
তোমার বুক থেকে,

জাদুমন্ত্র তার জানিয়ে দেয় তোমায়,
মৃত্যুই জীবন।
তোমার অন্তর থেকে সে হরণ করে নেয়
অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা,
বাহির করে নেয় অত্যুজ্জ্বল 'লাল'
তোমার খনি থেকে।
লাভকে সে সজ্জিত করে ক্ষতির পরিচ্ছদে
প্রশংসাভাজনকে করে তোলে সে নিন্দনীয়।
নিমজ্জিত করে সে তোমায় চিন্তার সমুদ্রে,
সরিয়ে দেয় তোমায় কর্ম থেকে দূরে।
পীড়িত সে,
কথায় তার বর্ধিত হয় আমাদের পীড়া :
যতবার তার পিয়ালা আসে ঘুরে,
পীড়াগ্রস্ত হয় সব পানকারীরা।
বসন্তে তার নেই কোনো বিদ্যুৎচমক, আর বৃষ্টি,
বাগিচা তার বর্ণ ও গন্ধের মরীচিকা।
সৌন্দর্যের তার নেই কোনো সম্বন্ধ সত্যের সাথে,
নেই কিছু ভগ্ন মুক্তা ছাড়া
তার সমুদ্রে।
তন্দ্রাকে সে মনে করত মধুরতর,
নিশ্বাসে তার নির্বাপিত হয়েছিল
আমাদের অগ্নি।
তার বুলবুলের সঙ্গীতে
বিষাক্ত হয়েছিল আত্মা ;
তার গোলাবের আস্তরণের নীচে
লুকিয়েছিল এক ভূজঙ্গ।

সতর্ক হওয়া তার সোরাহী আর পিয়ালা সম্বন্ধে !
সাবধান তার অত্যুজ্জ্বল সুরায়।
ওগো, তোমরা—যারা অবনমিত হয়েছ
তার সুরা-রসে,
আর যারা নিবদ্ধ করেছ দৃষ্টি তার গেলাসে
নব পূর্বাশার আশায়,
যাদের অন্তর হিম করে দিয়েছে
তার দুঃখ-সঙ্গীত,
তোমরা পান করেছ তীব্র হলাহল
কর্ণ দিয়ে !

তোমার জীবনের গতিধারাই হচ্ছে প্রমাণ
তোমার অধঃপতনের,
যন্ত্রের তন্ত্রী তোমার সুর-হীন!
পেটুকের শান্তিপ্রিয়তা করে তুলেছে তোমায় হতভাগ্য
একটা অবমাননা ইসলামের
সারা বিশ্বের বুকে।
অন্ধ করে দিতে পারে তোমায় কেউ
একটা গোলাবের শিরা দিয়ে,
মৃদু বায়ে করতে পারে তোমায় আহত।
প্রেম লজ্জিত হয়েছে তোমার বিলাপে,
সুন্দর ছবি তার বিকৃত হয়েছে
তোমার তুলিতে।
তোমার পীড়া বিবর্ণ করেছে তার গণ্ডস্থল,
তোমার শীতলতা হরণ করেছে ঔজ্জ্বল্য
তার অগ্নির।

সে হয়েছে অন্তর-পীড়াগ্রস্ত
তোমার অন্তর-পীড়া থেকে;
আর দুর্বল হয়েছে তোমার দুর্বলতায়।
পিয়ালা তার পূর্ণ শিশুর অশ্রুতে;
গৃহ তার ভরপুর দুর্ভাগ্যের হতাশ্বাসে!
মাতাল সে, ভিক্ষা মাগছে মদ্যশালার দ্বারে,
চুরি করে সুন্দরীদের দৃষ্টি,
জাফরীর ফাঁক দিয়ে
অসুখী, অবসন্ন আহত,—
প্রহরীর পদাঘাতে মৃত্যুর দ্বারে পতিত,
নলের মত বিনষ্ট দুঃখে,
মুখে তার সহস্র অভিযোগ
খোদার বিরুদ্ধে।
তোষামোদ আর আক্রোশ হল উপাদান তার দর্পণের.
অসহায়তা তার পুরাতন সঙ্গী;
এক শোচনীয় নীচ তাঁবেদার,
নেই যার কোনো মূল্য, আশা অথবা উদ্দেশ্য,
বিলাপ যার অপহরণ করেছে তোমার আত্মার সার
আর বিদূরিত করেছে শান্তির নিদ্রা
তোমার প্রতিবেশীর আঁখি থেকে।
দুর্ভাগ্য সেই অগ্নির যা গেছে নির্বাপিত হয়ে,

প্রেম—যা জন্ম নিয়েছিল পবিত্র ভূমিতে
আর মরেছে বোৎ-খানায় !

ওগো, কবিত্ব-ধন থাকে যদি তোমার ভাণ্ডারে,
ঘর্ষণ কর তা জীবনের পরশ-পাথরে !
অনাবিল চিন্তাধারা প্রদর্শন করে
কর্মের পথ,
যেমন বিদ্যুৎ-চমক অগ্রগামী হয় বজ্রের !
যোগ্য করবে তা তোমার সুষ্ঠু সাহিত্য-সৃষ্টির,
যোগ্যতা দেবে ফিরে যেতে আরব-ভূমিতে ;
অন্তর তোমার দিতে হবে
সাল্‌মা আরাবীকে,*
যেন হেজাজের পূর্বাশা জন্ম নেয়
কুর্দিস্তানের তিমির-রাত্রি থেকে।*

গোলাব আহরণ করেছ তুমি
পারস্যের গুল-বাগিচা থেকে
আর দেখেছ হিন্দুস্তান আর ইরানের ভরা জোয়ার
এখন অনুভব কর একবার
মরুভূর প্রচণ্ড তাপ ;
পান কর একবার প্রাচীন খর্জুর-সুরা !
পেতে দাও একবার তোমার মস্তক
তার তপ্ত বক্ষে,
পেতে দাও তোমার নাঙা দেহ তার উত্তপ্ত হাওয়ায় !
দীর্ঘকাল শায়িত ছিলে তুমি
রেশমের আস্তরণে ;
অভ্যাস কর এবার অমসৃণ তুলার বিছানা !

পুরুষানুক্রমে তুমি নৃত্য করেছ
সবুজের বুকে

---

* আরবী কাব্য সাধারণতঃ একটি প্রস্তাবনা নিয়ে শুরু করা হয় এবং তাতে কবির প্রেমাস্পদের উল্লেখ থাকে, অনেক সময় তার নাম দেওয়া হয় সাল্‌মা। এখানে 'সাল্‌মা আরাবী' বল্‌তে ইসলামী সাহিত্যের ও ধর্মের আদর্শ বুঝায়।

* এক অজ্ঞ কুর্দ ছাত্রদের কাছে সুফিবাদ সম্বন্ধে উপদেশ চেয়েছিল। তারা বলল যে, তাকে একটা দড়ি উপরে বেঁধে তার অপর দিকে পা বেঁধে ঝুলতে হবে ও তাদের শেখানো কথা আবৃত্তি করতে হবে। সে বুঝল না যে তাকে প্রতারিত করা হয়েছে। সে তাদের কথামতো কাজ করল। আল্লাহ্ তার ঈমানকে পুরস্কৃত করলেন। তার অন্তর আলোকিত হল। সে এমন জ্ঞান লাভ করল যে, বহু উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করত। সে বলত—"সন্ধ্যায় আমি ছিলাম কুর্দ পরদিন প্রভাতে হলাম আরব !"

আর ধৌত করেছ তোমার গণ্ডদেশ শিশির-জলে
গোলাবের মত।
এখন নিক্ষেপ কর আপনাকে
জ্বলন্ত বালুরাশির উপরে,
নিমজ্জিত হও জমজমের ঝর্ণায় !

আর কতকাল বৃথায় চীৎকার করবে তুমি
বুলবুলের মত?
কতকাল গড়বে তোমার আবাস বাগিচায়?

ওগো, ফাঁদে যাদের ধরা দেবে কল্পিত অমর পক্ষী,
বাঁধ নীড় উচ্চ পর্বতের শিখরে,
যে নীড় হবে বিদ্যুৎ আর বজ্রে ভরা
উচ্চতর ঈগলের নীড় অপেক্ষাও,
যেন তুমি যোগ্য হতে পার জীবন-যুদ্ধের,
যেন তোমার দেহ আর আত্মা দগ্ধ হতে পারে
জীবন-অনলে।

Lutfur Rahman Farooqui
Asstt. Professor/Research Fellow
Da'wah Academy
International Islami University
ISLAMABAD

নবম অধ্যায়

[আত্মার শিক্ষার তিনটি স্তর আছে : আইন ও নিয়মের অনুবর্তিতা, আত্মশাসন আর আল্লার প্রতিনিধিত্ব।]

আইন ও নিয়ম

উষ্ট্রের ধর্ম হল সেবা আর শ্রম,
ধৈর্য আর অধ্যবসায় তার স্বভাব।
বালুকাময় প্রান্তরের উপর দিয়ে
নিঃশব্দে করে সে পাদবিক্ষেপ ;
মরু–পথে চলে যত যাত্রী,
বাহন সে তাদের।
প্রতি মরূদ্যান অনুভব করে তার পাদক্ষেপ ;
আহারের জন্য নেই ব্যস্ততা, নিদ্রার জন্য নেই কাতরতা,
শ্রমে নেই ক্লান্তি।
যাত্রী পিঠে নিয়ে চলে সে,
আরো কত রকম বোঝা,
চলে সে অবিরাম
গন্তব্যপথের শেষ সীমানা পর্যন্ত।
চলাই তার আনন্দ,
যাত্রীর চাইতে ধৈর্য বেশি তার
অবিরাম পথ চলায়।

তুমিও, হে মানুষ,
কর্তব্যের বোঝা বইতে কর না অস্বীকার ;
তবেই পাবে লাভ করতে সেই স্বর্গপুর
যেখানে আল্লার নৈকট্য।
আইনের বিধান মেনে চল,
হে অমনোযোগী আত্মা।
বাধ্যতার পরিণামই স্বাধীনতা।
অলস ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষ হয়ে উঠে কর্মী
এই আইনের বিধান মেনে,
আর অবাধ্যতায় তার অন্তরের আগুন হয়ে যায় ছাই।

আইনের কারায় হবে সে বন্দী,
যে চায় ইংগিতে চালাতে
ওই দূর আকাশের সূর্য
আর অগণিত তারকারাজি।
বাতাস তখনি হয়ে ওঠে সুরভি,
যখন সে বন্দী হয় ফুলের বুকে,
সুরভি হয়ে ওঠে কস্তুরী,
যখন সে হয় বন্দী কস্তুরী–মৃগের নাভি–মূলে।
আকাশের তারা চলে তার গন্তব্যপথে
মাথা নত করে প্রকৃতির নিয়মের কাছে।
তৃণও জেগে ওঠে মাথা তুলে
সেও মানে ক্রমবর্ধনের নিয়ম ;
যখন সে করে তা পরিত্যাগ
দলিত হয় সে মানবের পদতলে।
প্রদীপের ধর্ম
নিজের বুকে অবিরাম আগুন জ্বেলে
আলোক–বিতরণ ;
আর রক্তের ধর্ম
শিরায় শিরায় নেচে চলা।
ছোট ছোট জল–বিন্দু
ঐক্যের নিয়মে হয়ে উঠে মহাসমুদ্র ;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা হয় সাহারা।
যদি আইনের বাধ্যতা
সকলের ভিতরে আনে অপরিমাণ শক্তি,
এই শক্তির উৎসকে
কেন করবে তুমি অবহেলা ?
ওগো, যারা ভুলে গেছ
প্রাচীন নিয়মকে—
ইসলামী নীতিকে,
আর একবার বদ্ধ কর তোমাদের পদযুগল
সেই রজত–শৃংখলে !
আইনের কঠোরতার জন্য কর না অভিযোগ,
দলিত কর না চরণ–তলে
মহামানুষ মুহাম্মদের বিধানকে।

আত্মশাসন

তোমার আত্মা পরোয়া করে শুধু নিজেকে
উষ্ট্রের মত ;
অহংকারী, আত্মশাসিত, স্বেচ্ছাচারী সে।
মানুষ হয়ে ওঠ,
ধর তার শাসন-রশ্মি নিজের হাতে,
যেন তুমি হতে পার হীরা-জহরত,
যদিও তুমি এক কুম্ভকারের মৃৎপাত্র।

অন্যের শাসন মানতে হয় তাকেই
যে শাসন করতে পারে না তার নিজেকে।
যখন তুমি সৃষ্ট হয়েছিলে মৃত্তিকা থেকে,
তোমার সৃষ্টির উপাদানে মিশ্রিত ছিল
প্রেম আর ভয় ;
ইহকালের ভয়, পরকালের ভয়, মৃত্যুর ভয়,
স্বর্গমর্ত্যের শত ব্যথা-বেদনার ভয় :
আর প্রেম,
ঐশ্বর্যের আর শক্তির প্রেম,
দেশ-প্রেম,
নিজের, স্বজনগণের আর পত্নীর প্রেম !
মানুষ,
যার মাঝে মৃত্তিকার সাথে মিশ্রিত হয়েছে জল,
ভালোবাসে শুধু শান্তি,
পাপাচার আর অসাধুতার প্রেমে সে আসক্ত।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র রশ্মি
যতক্ষণ আছে তোমার হস্তে,
করতে পারবে তুমি ব্যর্থ সকল ভয়ের আক্রমণকে।
আল্লাহ্ যার দেহের ভিতরে আত্মার মত,
অহমিকার কাছে শির তার অবনত হয় না।
ভীতি পায় না প্রবেশ-পথ তার বুকে,
আত্মা তার আর কাউকে করে না ভয় আল্লাহ্ ছাড়া।
আবাস যার অনস্তিত্বের পৃথিবীতে,
(উপাসনা করে না যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও
মুক্ত সে
পত্নীর আর সন্তান-সন্ততির প্রেম থেকে।
দৃষ্টি তার সংযত হয় সব দিক থেকে
শুধু আল্লাহ্ ছাড়া.

চালাতে পারে সে ছুরিকা
তার পুত্রের গলদেশে।
হতে পারে সে একা,
তবু সে একাই একটা বিরাট অভিযান–রত
বাহিনীর মত ;
জীবন তার কাছে মূল্যহীন বাতাসের চেয়েও।

ঈমান হল শুক্তি,
আর নামাজ তার মাঝে মুক্তা :
মুসলিমের আত্মা নামাজকে মনে করে ক্ষুদ্রতর হজ্।
মুসলিমের হাতে নামাজ তরবারির মত,
হত্যা করে তা দিয়ে সে
পাপ, স্বেচ্ছাচার আর অন্যায়কে।
রোজা দমন করে ক্ষুধা–আর তৃষ্ণাকে ;
ভেঙে ফেলে সে ইন্দ্রিয়পরতার দুর্গম দুর্গ।
হজ্ ঈমানদারের আত্মাকে করে আলোকিত।
শিক্ষা তার নিজ গৃহ থেকে বিচ্ছেদ,
ছিন্ন করে সে স্বদেশের বন্ধন ;
সকলের অন্তরে একত্বের অনুভূতি—সেই-ই তো ধর্ম ;
ধর্মগ্রন্থের ছিন্ন পত্রগুলিকে বেঁধে দেয় সে
একই গ্রন্থিতে।
জাকাত ঐশ্বর্যলিপ্সাকে করে বিদূরিত
আর একত্ববোধকে করে নিকটতর ;
পুণ্য দ্বারা করে সে আত্মার সংরক্ষণ,
সে ঐশ্বর্যকে করে বর্ধন,
হ্রাস করে দেয় ঐশ্বর্যের লিপ্সা।

এই সবই হল সত্যিকার পন্থা
তোমার আত্মাকে শক্তিশালী করে তোলবার,
অজেয় তুমি,
যদি তোমার ইস্‌লাম হয় শক্তিশালী।
শক্তি সঞ্চয় কর
সর্বশক্তির উৎস আল্লার প্রার্থনা থেকে,
তবেই তুমি পারবে আরোহী হতে
তোমার দেহের উষ্ট্রে।

আল্লার প্রতিনিধি

যদি তুমি শাসনে রাখতে পার
তোমার উষ্ট্রকে,
তবেই তুমি পারবে বিশ্বকে শাসন করতে,
আর পরতে পারবে তোমার শিরে
সোলায়মানের রাজমুকুট।
তুমি হবে বিশ্বের গৌরব
যতদিন থাকবে তার অস্তিত্ব,
তুমি শাসন করবে সেই রাজ্য,
যেখানে নেই কোনো ব্যাভিচার।
আল্লার প্রতিনিধি হওয়া এই বিপুল বিশ্বে,
আর আধিপত্য করা
তাঁর সৃষ্ট পদার্থের উপর,
কত মধুর আনন্দময় !

আল্লার প্রতিনিধি
এই বিপুল বিশ্বের আত্মা-স্বরূপ,
তার অস্তিত্ব সেই মহানামের প্রতিবিম্ব।
সে জানে
খণ্ড ও অখণ্ডের অন্তর্নিহিত রহস্য ;
পালন করে সে আল্লার নির্দেশ
এই বিরাট ধরিত্রীর বুকে।
যখন সে তার শিবির সন্নিবেশ করে
এই বিস্তৃত ধরণীর উপর,
আবর্তন করে সে মহাকালের আস্তরণ।
প্রতিভা তার জীবন-ধারায় পরিপূর্ণ,
আর চায় সে স্বয়ম প্রকাশ হতে ;
অস্তিত্বে আনবে সে আর একটা নূতনতর বিশ্ব।
খণ্ড ও অখণ্ডের এই বিশ্বের মত
অনন্ত বিশ্ব জাগ্রত হয়ে ওঠে
গোলাব-পাপড়ির মত
তার কল্পনার বীজ থেকে।
অপরিণত প্রকৃতিকে সে করে তোলে পরিপক্ব,
বিদূরিত করে দেয়
সব মৃন্মূর্তিকে মন্দির-বেদী থেকে।
স্পর্শে তার
অন্তরের তন্ত্রীতে জাগ্রত হয় অমর-গীতি,

সে জাগ্রত হয় আর নিদ্রিত হয়
শুধু আল্লারই জন্য।
তার যুগকে সে শিখিয়ে যায়
যৌবনের জয়গান
আর রাঙিয়ে তোলে সব কিছুকে
যৌবনের রঙে।
মানব জাতির কাছে বহন করে আনে সে
আনন্দ–বার্তা আর সতর্ক–বাণী,
সৈনিক হয়ে আসে সে,
সে হয়ে আসে সেনাপতি এবং রাজা।

"আল্লাহ্ আদমকে শিখিয়েছিলেন
সব পদার্থের নাম।"—
এই বাণীর কারণ সে।
"প্রশংসা তাঁরই
যিনি প্রেরণ করেছেন
তাঁর রসুলকে রাত্রির অন্ধকারে।"—
সে–ই হোল
অন্তর্নিহিত রহস্য এই বাণীর।
আসা* হাতে পেয়ে
শক্তিমান হয়ে ওঠে তার শ্বেত হস্ত,
তার জ্ঞানের সাথে এসে মিলিত হয়
এক পরিপূর্ণ মানুষের শক্তি।
বীর অশ্বারোহী সৈনিক
যখন ধারণ করে তার রশ্মি,
কালের অশ্ব তখন
ছুটে চলে দ্রুততর গতিতে।
তার আশ্চর্য মুখাবয়ব
শুষ্ক করে তোলে লোহিত সাগরকে,
চালিত করে সে ইস্রাইলদেরকে
মিসরের বাহিরে।
তার কণ্ঠে যখন ধ্বনি ওঠে,
'জাগ্রত হও,'
তখন মৃত আত্মাসমূহে জেগে ওঠে
তাদের সমাধি–তলে
ময়দানের মাঝে পাইন–বৃক্ষের মত।

---
* আসা—যষ্ঠি

তার ব্যক্তিত্ব
সারা পৃথিবীর কাছে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ,
মহিমায় তার সমগ্র ধরিত্রী পায় পরিত্রাণ।
তার সেই পরিত্রাণ-কর্তা রূপের প্রতিবিম্ব
অণুপরমাণুকে করে সূর্যের সাথে পরিচিত,
তার অন্তরের ঐশ্বর্য করে তোলে মূল্যবান সব কিছুকে
যার অস্তিত্ব আছে।
সে বিতরণ করে জীবন-ধারা
তার অলৌকিক কর্ম দ্বারা,
জীবনের প্রাচীন ধারাকে সে করে তোলে নূতনতর।
দীপ্তিমান স্বপ্ন
জেগে ওঠে তার পদাংক থেকে,
তার সিনাই দ্বারা প্রবিষ্ট হয় কত মুসা।

সে দিয়ে যায় জীবনের নূতনতর ব্যাখ্যা,
এই স্বপ্নের একটা নূতনতর অর্থ।
তার লুক্কায়িত সত্তাই হল জীবনের রহস্য,
জীবন-বীণার না-শোনা সংগীত।
প্রকৃতি ভোগ করছে যুগ-যুগান্তর ধরে প্রসব-বেদনা
রক্তাক্ত হয়ে শুধু জন্ম দিতে তার ব্যক্তিত্ব।
এক মুঠা মৃত্তিকা
উঠে গেছে নভোবিন্দুতে
সেই মৃত্তিকায় জন্ম নেবে
এক বিজয়ী বীর।
আজকের ভস্মের মাঝে
ঘুমিয়ে আছে এমন এক অগ্নি,
যা কাল সমগ্র বিশ্বকে করবে জ্বালাময়
তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে।
আমাদের কুঁড়িরা
ফুটিয়ে তুলবে এক বাগান গোলাব,
আমাদের চক্ষু
অনাগত ঊষার আশায় সমুজ্জ্বল।
নেমে এস, ওগো অদৃষ্টের আরোহী !
নেমে এস, ওগো মহা পরিবর্তনের আঁধারের আলো !
অস্তিত্বের দৃশ্যকে জ্যোতিষ্মান করে তোল,
আমার আঁখির অন্ধকারে তুমি এসে স্থান নাও।
জাতির কোলাহলকে করে দাও নিস্তব্ধ,

তোমার সংগীত
স্বর্গের মাধুরী বয়ে আনুক
আমাদের কর্ণের কাছে।

জাগ্রত হও,
বাজিয়ে তোল বীণায় ভ্রাতৃত্বের সুর,
ফিরিয়ে দাও আমাদেরকে সেই প্রেমের সুরাপাত্র।
আর একবার
বয়ে আন সেই শান্তির দিন এই পৃথিবীতে,
শান্তির বাণী পৌঁছে দাও তাদের কানে,
যারা চায় যুদ্ধ!
মানব-জাতি শস্য-ক্ষেত্র,
আর তুমি তার ফসল,
তুমি জীবন-যাত্রীর কাফেলার
গন্তব্য পথের শেষ সীমানা!
হেমন্তের নিষ্ঠুরতায়
সব বৃক্ষ-পত্র গেছে ঝরে,
ওগো বয়ে এস তুমি বসন্তের মত
আমাদের উদ্যানের উপর দিয়ে!
গ্রহণ কর অবনত ললাট থেকে আমাদের
শিশু, যুবা, বৃদ্ধ—সকলের আনন্দ-অভিবাদন।

আমাদের যা কিছু সম্মান,
শুধু তোমারই ঋণ।
আজ আমরা নীরবে বয়ে যাই
জীবনের ব্যথা-বেদনা।

দশম অধ্যায়

[হযরত আলীর (রাঃ) নাম সমূহের ভেতরের অর্থ নিয়ে]

আলী—প্রথম মুসলিম আর মানুষের রাজা,
প্রেমের দৃষ্টিতে আলী ঈমানের ভাণ্ডার।
পরিবারের প্রতি তাঁর অনুরাগ
অনুপ্রাণিত করে আমায় জীবন–ধারায়,
যেন আমি একটি দীপ্তিমান মুক্তা।

নার্গিস ফুলের মত
আনন্দিত আমি স্থির দৃষ্টিপাতে ;
সুরভির মত আমি দিশাহারা হয়ে ছুটি
তাঁর প্রমোদ–নন্দনের ভিতর দিয়ে।

যদি পবিত্র জল–ধারা
নির্গত হয় আমার ভূমি থেকে,
উৎস তার তিনিই ;
যদি সুরা নির্গত হয় আমার দ্রাক্ষা–বক্ষ থেকে,
তিনিই তার কারণ।
ধূলিমুষ্টি আমি,
কিন্তু সূর্য তাঁর করেছে আমায়
দর্পণের মত,
সংগীত দৃশ্যমান আমার বক্ষোমাঝে।
মহান নবী দেখেছিলেন কত শুভ লক্ষণ
আলীর মুখ দর্পণে,
গৌরবে তাঁর গৌরবী হয়েছে সত্যধর্ম।
আদেশ তাঁর ইসলামের শক্তি–স্বরূপ ;
সকল পদার্থ হয় ভক্তি–প্রণত
তাঁর বংশের কাছে।

আল্লার রসুল দিয়েছিলেন তাঁর নাম 'বু–তোরাব'
আল্লাহ্ কোর্‌আনে দিয়েছেন তাঁর নাম
'আল্লার হস্ত'

যে কেহ পরিচিত জীবন-রহস্যের সাথে—
জানে আলীর নামসমূহের
অন্তর্নিহিত অর্থ।

সেই মলিন কর্দম— যার নাম দেহ,
যুক্তি আমাদের বিক্ষুব্ধ হচ্ছে তার দুষ্কৃতির জন্য।
শুধু তারই জন্য
নভোস্পর্শী চিন্তাধারা আমাদের
লুণ্ঠিত হয় ধরণীর ধূলিতলে।
সে আমাদের আঁখিকে করে অন্ধ
আর কর্ণকে করে তোলে বধির।
হাতে তার প্রলোভনের দুধারী তল্‌ওয়ার :
এই দস্যু-হস্তে বিদীর্ণ হয় পথিকের বক্ষ।
আলী—আল্লার সিংহ—
দমিত করেছিলেন দেহের কর্দমকে
আর পরিণত করেছিলেন মলিন মৃত্তিকাকে সুবর্ণে।
মুর্‌তজা—তরবারির ঝলকে যাঁর
সপ্রকাশ হত সত্যের শিখা,
লাভ করেছিলেন বু-তোরাব খেতাব,
তাঁর দেহকে জয় করে ; *
মানুষ দিগ্বিজয়ী হয় যুদ্ধে তার দুর্দম শক্তিতে,
কিন্তু তাঁর অন্তরের অত্যুজ্জ্বল মণি
তার আত্মজয়।

এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হতে পারে তোরাব,
ইংগিতে তার সূর্য উদিত হয়
পশ্চিম গগন থেকে ; *
যে কেহ রশ্মি ধারণ করে দৃঢ়রূপে
তার দেহের অশ্বের,
অধিষ্ঠান করে মধ্যমণির মত
রাজ মুকুটের মাঝে :
এই খানেই ধূলিলুণ্ঠিত হয় খয়বরের শক্তি
তার চরণ-তলে +

---

* 'মুরতজা' মানে আল্লাহ্ যাঁর উপর খুশি– আলীর অন্যতম নাম। বু তোরাব' মানে 'মৃত্তিকার পিতা'।

* আলীর একটি মাজেজার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

+ খয়বর হেজাজের একটি গ্রাম। খয়বর দুর্গ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বাহিনীর করতলগত হয়। সেই যুদ্ধে আলী অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

রোজ-কিয়ামতে হস্ত তার পরিবেশন করবে
আবে-কাওসার। ++
আত্ম-জ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম করেছিলেন আল্লার হস্তের,
আল্লার হস্ত হয়েই
শাসন চালিয়েছিলেন সকলের উপর।
তিনি ছিলেন দুর্গ-দ্বার বিজ্ঞানের নগরীর ; *
আরব, চীন ও গ্রীস হয়েছিল তার পদানত।

যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব করতেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।
মৃত্তিকায় পরিণত হওয়া পতংগের ধর্ম ;
জয়ী হও মৃত্তিকার উপর,
সেই হল যোগ্য কাজ মানবের।
কমনীয় তুমি কুসুমের মত,
কঠোর হয়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেন তুমি হতে পার জান্নাতের প্রাচীর-ভিত্তি !
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।
তোমার আপন মৃত্তিকা থেকে
যদি তুমি নির্মাণ না কর তোমার প্রাচীর অথবা দ্বার,
অপর কেহ নির্মাণ করবে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।
ওগো,—যে অভিযোগ কর আল্লার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে,
কাঁচ যার চীৎকার করে
প্রস্তরের অবিচারের বিরুদ্ধে,
আর কতকাল এই বিলাপ, চীৎকার আর শোক?

আর কত চলবে এই চিরন্তন বুক চাপড়ানি?
জীবনের সার লুক্কায়িত কর্মের ভিতরে,
সৃষ্টির আনন্দই হচ্ছে জীবনের নিয়ম।
জাগ্রত হও, সৃষ্টি কর নূতন জগৎ !
আবৃত কর আপনাকে অনল-শিখায়,
হয়ে ওঠ এব্রাহিমের মত !

++ 'আবে-কাওসার'—স্বর্গীয় নদ।
* হযরত রসুল (দঃ) বলেছেন— "আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী তার দুর্গদ্বার।" —হাদিস।

এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা,
যে ভালোবাসে না তোমার সংকল্পকে,
সে শুধু দূরে নিক্ষেপ করা বর্ম
সমর-ক্ষেত্রের মধ্যে।
সবল-চরিত্র মানব—
যে প্রভু তার আপনার,
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ।

যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা করবে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গের সাথে ;
খনন করবে সে বিশ্বের ভিত্তিমূল
আর লাগাবে তার প্রতি পরমাণুকে নব সৃষ্টিতে।
বিপর্যস্ত করবে সে সময়ের গতিকে,
আর ধ্বংস করবে নীল আকাশের আবরণ ;
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি করবে একটা নবীন বিশ্ব—
যা চলবে তার খুশিতে।
যে বেঁচে থাকতে পারে না এই বিশ্বের বুকে
মানুষের মত,
তার বীরের মত মৃত্যুবরণই শ্রেয় !
আছে যার সতেজ অন্তর,
প্রমাণিত করবে সে তার শক্তি
মহান কর্ম দ্বারা।
মধুর প্রেমকে ব্যবহার করা কঠোর কর্তব্যে,
আর গোলাব সংগ্রহ করা এব্রাহিমের মত
অনল-কুণ্ড থেকে।

কর্ম-প্রিয় মানুষের শক্তি
প্রকাশ লাভ করে—
যা কিছু কঠোর, তাকে গ্রহণের ভিতর দিয়ে।

নীচ আত্মার নেই কোনো অস্ত্র
আর্তবিলাপ ছাড়া,
জীবনের আছে একটি মাত্র নিয়ম।
জীবন শক্তির প্রকাশ,
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা।

অপাত্রে করুণা

জীবনের শোণিত-ধারাকে করে শীতল,
তা হচ্ছে জীবন-সংগীতের ছন্দপাত।
অকীর্তির গভীরে যে আছে নিমজ্জমান,
সে দুর্বলতাকে বলে সন্তোষ।

দুর্বলতা জীবনের লুণ্ঠনকারী,
উদর তার পরিপূর্ণ ভয় আর মিথ্যায়।
আত্মা তার ধর্মহীন,
পরিপুষ্ট হয় পাপ তার দুগ্ধ পানে।
ওগো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানব
সাবধান!
এই লুণ্ঠনকারী আড়ি পেতে আছে
গোপন গুহায়,
তার দ্বারা প্রতারিত হয়ো না, যদি তুমি হও জ্ঞানী,
বহুরূপীর মত,
প্রতি মুহূর্তে সে পরিবর্তন করে তার রঙ।
তীক্ষ্নদর্শীর চোখেও ধরা দেয় না তার রূপ :
পর্দার আবরণ তার মুখের উপর।
এখন সে আবৃত দয়া আর সৌজন্যে,
এখন সে পরিহিত মানবতার পরিচ্ছদ।
কখনো সে গ্রহণ করে বাধ্যতার ছদ্মবেশ,
কখনো ক্ষমনীয় রূপ।

সে প্রকাশিত হয় আত্ম-চরিতার্থতার রূপে
আর হরণ করে বলশালীর অন্তর থেকে সাহস।
শক্তি সত্যের যমজ ভ্রাতা ;
যদি তুমি জান তোমার আত্মাকে,
শক্তি সত্য-প্রকাশের দর্পণ।
জীবন বীজ, আর ক্ষমতা তার ফসল ;
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয়
সত্য-মিথ্যার রহস্য।
কোনো দাবীদার, —যদি থাকে তার ক্ষমতা,
প্রয়োজন নেই তার দাবীর সপক্ষে
কোনো যুক্তির।
মিথ্যা ক্ষমতা থেকে গ্রহণ করে সত্যের অধিকার
আর সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে
মনে করে তাকে সত্য।

সৃজনকারী বাণী তার হলাহলকে রূপ দেয় অমৃতের ;
শ্রেয়কে বলে সে,— 'নিকৃষ্ট তুমি'
আর শ্রেয় হয়ে যায় নিকৃষ্ট।
ওগো, অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি প্রদত্ত বিশ্বাসে,
বিশ্বাস কর নিজদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা বলে। *
লাভ কর জ্ঞান জীবন-রহস্যের !
দুর্দমনীয় হও !
হেলায় অপসারিত কর আল্লাহ্ ছাড়া সকলকে !
ওগো জ্ঞানী মানুষ,
খুলে দাও তোমার চক্ষু, কর্ণ আর মুখ !
তারপরও যদি না পাও সত্যের পন্থা,
গালি বর্ষণ কর আমায় !

* স্বর্গ-মর্ত্যে আল্লার প্রদত্ত একটি জিনিস কেউ গ্রহণ করে নি। শুধু গ্রহণ করেছে এই মানুষ জাতি। তা হচ্ছে 'আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব'— মানে আল্লার গুণরাজিকে মানবচরিত্রে সপ্রকাশ করে তোলা।

একাদশ অধ্যায়

[একটি কাহিনী। মরভ দেশীয় এক যুবক দরবেশ আলী হুজিরী রাহ্‌মাতুল্লাহ আলায়হের দরবারে এসে হাজির হয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তাঁর দুশমনদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছেন।]

হুজিরের দরবেশ ছিলেন সম্মানিত
মানুষের কাছে ;
পীর-ই-সঞ্জর তাঁর সমাধি দর্শন করেছিলেন
তীর্থযাত্রী হয়ে। *
সহজেই তিনি অতিক্রম করেছিলেন পর্বতের বাধা
আর বহন করেছিলেন ইসলামের বীজ
হিন্দুস্তানের বুকে।
ঐশী ক্ষমতায় তিনি ফিরিয়ে এনেছিলেন
ওমরের যুগ,
বাণীতে তাঁর জেগে উঠেছিল সত্যের খ্যাতি।
তিনি ছিলেন কোর্‌আনের সম্মান-রক্ষক,
দৃষ্টিতে তাঁর ধসে পড়েছিল
মিথ্যার মন্দির।
নিশ্বাসে তাঁর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল
পাঞ্জাবের ধূলিকণা,
রবিরশ্মিতে তাঁর অত্যুজ্জ্বল হয়েছিল
আমাদের পূর্বাশা।

তিনি ছিলেন প্রেমিক
আরো ছিলেন প্রেমের দূত ;
ভ্রূযুগ হতে তাঁর বিচ্ছুরিত হত,
প্রেমের গোপন বাণী।

---

* দরবশে আলী হুজিরী (রাঃ) আফগানিস্তানের গজ্‌নীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রাচীন পারস্য সুফি-তত্ত্বের রচয়িতা ছিলেন। তিনি ১০৭২ অব্দে লাহোরে দেহত্যাগ করেন। 'পীর-ই-সঞ্জর' বলিতে বিশ্ববিখ্যাত দরবেশ হযরত মুইনউদ্দীন চিশতীকে বুঝায়। তিনি ১২৩৫ অব্দে আজমীর শরীফে দেহত্যাগ করেন।

বলব আমি তাঁর পূর্ণতার এক কাহিনী
আর বেঁধে দেব সব গোলাবের আস্তরণকে
একটি মাত্র কলির সাথে।
এক তরুণ যুবক— সাইপ্রেস বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘতনু,
এসেছিলেন মরভ থেকে লাহোরে।
দর্শন করতে গেলেন তিনি ভক্ত দরবেশকে
যেন সূর্যরশ্মি বিদূরিত করে
তাঁর অন্ধকার।
"উৎপীড়িত আমি দুশমনদের দ্বারা"—
বললেন তিনি,
"কাচের মত আমি প্রস্তরের মাঝখানে।
শিক্ষা দিন আমায় ওগো স্বর্গীয় সম্মান-প্রাপ্ত দরবেশ,
কি ভাবে অতিবাহন করব আমার জীবন
দুশমনদের মাঝখানে!"

জ্ঞানী পথ-প্রদর্শক—
চরিত্রে যার প্রেম জন্ম দিয়েছিল
সৌন্দর্য ও গৌরব—
বললেন উত্তরে :
"তুমি জীবন-সংগীতের সাথে নহ পরিচিত,
অসতর্ক তার অন্ত ও আদি সম্বন্ধে।
নির্ভীক হও অপরের থেকে!
তুমি একটা ঘুমন্ত শক্তি;
জাগ্রত হও!
প্রস্তর যখন ভাবল তার নিজকে কাচ বলে,
সে হল কাচে পরিণত
আর হল ভঙ্গুর।
যদি পথিক মনে করে নিজকে দুর্বল,
সে আত্ম-বিসর্জন করে দস্যু-হস্তে।
কতকাল আর তুমি ভাববে নিজেকে জল ও কর্দম বলে?
তোমার কর্দম থেকে তুমি সৃষ্টি কর
এক জ্বালাময় সিনাই।
কেন ক্রুদ্ধ হও শক্তিমান মানুষের বিরুদ্ধে?
কেন অভিযোগ কর দুশমনের জন্য?
ঘোষণা করব আমি সত্য :
দুশমনই তোমার বন্ধু!

অস্তিত্ব তার পরায় তোমায় গৌরবের রাজ-মুকুট।
অপরিচিত সে আত্মার অবস্থার সাথে,
শক্তিমান দুশমনকে মনে করে সে।
আল্লার আশীর্বাদ।

মানব-বীজের কাছে দুশমন শ্রাবণের মেঘ :
জাগ্রত করে সে তার অন্তর্নিহিত শক্তি।
যদি তোমার আত্মা হয় শক্তিশালী,
তোমার পথের প্রস্তর হবে জলের মত ;
কিসে ভয় করে পথের উত্থান-পতনের স্রোত?
সংকল্পের অসি শাণিত হয় পথের প্রস্তরে
আর প্রমাণিত করে আপনার শক্তি
পদে পদে বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে।
কী লাভ পশুর মত আহার-নিদ্রায়?
কী লাভ তোমার সত্তায়
যদি শক্তি না থাকে তোমার অন্তরে?
যখন তুমি আত্মা দ্বারা কর আপনাকে শক্তিমান,
ধ্বংস করতে পার তুমি বিশ্বকে
তোমার খোশ-খেয়ালে।
যদি তুমি বরণ কর মৃত্যু, আত্মমুক্ত হও ;
যদি তুমি থাক জীবন্ত, পরিপূর্ণ হও আত্মায়! *
মৃত্যু কী? আত্মবিস্মৃত হওয়া।
কেন কল্পনা কর তাকে দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ বলে?
দৃঢ় হও আত্মায় ইউসুফের মত!
বন্দীদশা থেকে অগ্রসর হও রাজত্বে!
ভাব আত্মার কথা, কর্মপ্রিয় মানুষ হও!
আল্লার মানুষ হও,
বহন কর রহস্য অন্তরে!"

আমি করব সকল পদার্থের ব্যাখ্যা কাহিনীর সাহায্যে,
ফুটিয়ে তুলব আমি কুঁড়িকে
আমার নিশ্বাসের শক্তিতে।
'উৎকৃষ্টতর প্রেমিকের কাহিনী বর্ণনা
অপরের মুখ দিয়ে।'+

* এখানে প্রাচীন সুফী মতকে সংশোধন করা হয়েছে যে, মৃত্যু দ্বারা সুফী চিরন্তন জীবন লাভ করে আল্লার সাথে।

+• মসনভি শরীফ।

দ্বাদশ অধ্যায়

[একটি তৃষ্ণাতুর পাখির কাহিনী]

একটি পাখি হয়েছিল তৃষ্ণার্ত,
দেহের নিশ্বাস তার হয়ে এসেছিল ভারি
ধূম-কুণ্ডলীর মত।
বাগিচার ভিতরে দেখল সে একখণ্ড হীরক,
তৃষ্ণা জন্মাল এক জলের মায়া।
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রস্তরের প্রতারণায়
অজ্ঞ পাখি ভাবল তাকে জল।
সে পেল না কোনো রস এই হীরকের বুকে,
সে ঠোকরাতে লাগল তাকে চঞ্চু দ্বারা,
কিন্তু তাতে সিক্ত হল না তার তালু।

"ওরে ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার দাস,"—বললে হীরক,—
"শাণিত করেছ তোমার লুব্ধ চঞ্চু আমার উপর,
কিন্তু আমি নহি শিশির-বিন্দু, দিই না আমি পানীয়,
বেঁচে থাকি না আমি অপরের জন্য।
আঘাত কর তুমি আমাকে?
উন্মাদ তুমি।
যে জীবন সপ্রকাশ করে আত্মাকে,
পরিচয় নেই তোমার তার সাথে।
আমার জল ভেঙে দেবে পক্ষীর চঞ্চু,
আর ভাঙবে মানব-জীবনের রত্ন।" *
পাখি লাভ করল না তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা
হীরকের কাছে,
আর ফিরে এল দীপ্ত প্রস্তরখণ্ডের কাছ থেকে।
হতাশা জাগ্রত হল তার বুকে,
তার কণ্ঠের সংগীত পরিণত হল আর্ত বিলাপে।

---

* হীরককে গ্রাস করলে মানবের হয় মৃত্যু।

গোলাব-শাখার উপর এক বিন্দু শিশির
জ্বল্‌জ্বল করছিল
বুল্‌বুলের আঁখি-কোণে অশ্রুর মত,
তার দীপ্তি ছিল সূর্যকরেরই জন্য,
সূর্যের ভয়ে সে ছিল প্রকম্পিত,
একটি বিচঞ্চল আকাশোদ্ভূত তারকা
মুহূর্তের জন্য পতিত ভূমিতলে,
আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিদৃশ্যমান,
কখনো প্রতারিত কলি এবং পুষ্প দ্বারা,
সে লাভ করে নি কিছুই জীবন থেকে।
সে ছিল ঝুলায়মান, পতনোন্মুখ,
অশ্রুর মত প্রেমিকের আঁখিকোণে,
যে হারিয়েছে তার অন্তরতমকে।
সেই আর্ত বিপন্ন পাখি
লাফিয়ে বসল গিয়ে গোলাব-কুঞ্জের ভিতরে,
শিশির-বিন্দু ঝরে পড়ল তার মুখে।

ওগো, যে মুক্ত করবে তোমার আত্মাকে শত্রু-হস্ত থেকে,
জিজ্ঞাসা করি তোমায়,
"তুমি কি সলিল-বিন্দু, না একটি রত্ন?"
পাখি যখন বিগলিত হচ্ছে তৃষ্ণার অনলে,
সে তখন গ্রাস করেছে অপরের জীবন।
বিন্দুটি ছিল না কঠিন, রত্নতুল্য ;
হীরকের ছিল আত্মা, যা ছিল না বিন্দুর।
কখনো মুহূর্তের জন্য আত্ম-সংরক্ষণে কর না অবহেলা :
হয়ে ওঠ হীরক, শিশির-বিন্দু নয়!
প্রকৃতিতে হও বৃহদায়তন, পর্বতের মত,
শিখরে তোমার বহন কর মেঘমালা
বর্ষা সলিলে পরিপূর্ণ!
রক্ষা কর আপনাকে আত্মস্বীকৃতি দ্বারা,
সংকুচিত কর তোমার পারদকে রজত-রেখায়!
সৃষ্টি কর বিলাপ-গীতি তোমার আত্মার তন্ত্রীতে,
সপ্রকাশ কর আত্মার রহস্য!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[হীরক ও কয়লার কাহিনী।]

এখন আমি খুলে দেব আর একটি সত্যের দ্বার,
বলব আমি তোমায় আর একটি কাহিনী।
খনির ভিতরে কয়লা বললে হীরককে,
"ওগো চিরন্তন জ্যোতির্ময়,
সাথি আমরা, আর সত্তা আমাদের এক ;
একই আমাদের অস্তিত্বের মূল,
তবু যখন আমি মরে যাই অকিঞ্চিৎকরতার
যাতনায়,
তখন স্থান তোমার সম্রাটের মুকুটে।
এত কুৎসিত আমার উপাদান,
আমি মৃত্তিকা অপেক্ষাও কম দামী,
আর দর্পণের বক্ষ বিদীর্ণ হয় তোমার সৌন্দর্যে।
অন্ধকার আমার আলোময় করে উত্তপ্ত পাত্রকে,
তারপর আমার সার যায় ভস্মীভূত হয়ে।
প্রত্যেক মানুষ স্থাপন করে তার পদ আমার মস্তকে
আর আবৃত করে আমার সত্তাকে
ভস্ম দ্বারা।
দুঃখিত হতেই হবে আমার অদৃষ্টে ;
জান তুমি, আমার সত্তার সার কোথায় ?
সে হচ্ছে একটা ঘনীভূত ধূমকুণ্ডলী,
সাথে তার একটি মাত্র স্ফুলিংগ।
বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিতে তুমি তারকা-তুল্য,
সবদিক থেকে তোমার বিচ্ছুরিত হয় জ্যোতি।
এখন তুমি পরিণত হও রাজার আঁখির আলোয়,
কখনো সজ্জিত কর
তরবারির হাতল।"

"ওগো বিচক্ষণ বন্ধু"—হীরক বললে,—
"মলিন মৃত্তিকা যখন হয় শক্ত,
মর্যাদায় হয় তখন প্রস্তরাধার তুল্য।

পারিপার্শ্বিকতার সাথে চলে তার সংগ্রাম,
সংগ্রামে পরিপক্ব হয়ে সে হয় কঠোর
প্রস্তরের মত।
পরিপক্বতাই প্রদান করেছে আমায় আলোক
আর পূর্ণ করেছে আমার বক্ষ জ্যোতিতে।
যেহেতু সত্তা তোমার অপরিপক্ব,
তাই তুমি হয়েছ নীচ ;
দেহ তোমার কোমল বলেই হয় দগ্ধীভূত।
পরিত্যাগ কর ভয়, দুঃখ আর উদ্বেগ,
কঠোর হয়ে ওঠ প্রস্তর–তুল্য,
হয়ে ওঠ হীরক–খণ্ড !

যে করে কঠোর সংগ্রাম আর ধারণ করে দৃঢ়হস্তে,
উভয় জগৎ আলোকিত হয় তার দ্বারা।
একটু সামান্য মৃত্তিকা কৃষ্ণ প্রস্তরের মূল
যে তার মস্তক স্থাপন করেছে
কাবার বক্ষে ;
মর্যাদা তার উচ্চতর সিনাই অপেক্ষা।
সে চুম্বন লাভ করে কৃষ্ণ ও শুভ্র সকলের
কঠোরতায় নিহিত রয়েছে জীবনের গৌরব ;
দুর্বলতাই হল অকিঞ্চিতকরতা ও
অপরিপক্বতা।”

চতুর্দশ অধ্যায়

[শেখ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী। তারপর হিমালয় ও গঙ্গা নদীর কথোপকথন। এর সারমর্ম—সমাজ-জীবনের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের সাথে দৃঢ় বন্ধনের উপর।]

কাশীতে ছিল এক সম্মানিত ব্রাহ্মণ,
মস্তিষ্ক তার নিমজ্জিত ছিল
সত্তা ও অসত্তার মহাসমুদ্রে।
ছিল তার বিরাট জ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রে—
অতি-নিবিষ্ট ছিল সে
ঈশ্বর-সন্ধানীদের কাছে।
ব্যস্ত ছিল তার অন্তর নূতন সমস্যার আলোচনায়,
বুদ্ধি তার বিচরণ করত
সপ্তর্ষিমণ্ডলের উচ্চতায় ;
নীড় তার ছিল অংক পাখির নীড়ের মত উচ্চে ; *
রবি-শশী নিক্ষিপ্ত হত তার চিন্তার অনলে,
ইন্ধনের মত।
দীর্ঘকাল সে করল পরিশ্রম
আর হল ঘর্মাক্ত,
কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আনল না কোনো সুরারস
তার পিয়ালায়।
যদিও সে পাতল বহু ফাঁদ
জ্ঞানের বাগিচায়,
ফাঁদে তার কোনো দিন দিল না ধরা
তার আদর্শ পক্ষী ;
যদিও চিন্তার নখর হল তার শোণিত-সিক্ত,
সত্তা ও অসত্তার বন্ধন থাকল অসংবদ্ধ।
তার ওষ্ঠের দীর্ঘশ্বাস সাক্ষ্য দিলো তার হতাশার,
আকৃতি তার প্রকাশ করলে কাহিনী
তার বিভ্রান্তির।

---

* একপ্রকার রহস্যময় পাখি। তার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না।

একদিন হল তার মোলাকাত এক প্রসিদ্ধ শেখের সাথে,
বক্ষে যাঁর ছিল একটি অন্তর
সুবর্ণময়।
ব্রাহ্মণ দিলে নীরবতার মোহর তার ওষ্ঠযুগলে,
কর্ণকে অভিনিবিষ্ট করলে
সেই দরবেশের আলাপনে।
তারপর বলতে লাগলেন শেখ,—
"ওগো অত্যুচ্চ আকাশ-লোক-চারী,
প্রতিজ্ঞা কর একটু সত্য হতে এই পৃথিবীর কাছে!
পথ-হারা হয়েছ তুমি
কল্পনার গহন অরণ্যে,
নির্ভীক চিন্তাধারা তোমার ছাড়িয়ে গেছে স্বর্গলোক।
আপোষ কর পৃথিবীর সাথে,
ওগো নভোচারী মুসাফির!
ঘুরে মর না তারকা-মণ্ডলীর সার অনুসন্ধানে!
আদেশ করছি না আমি পরিত্যাগ করতে মূর্তিপূজা!
অবিশ্বাসী তুমি?
উপযুক্ত হও তোমার জুন্নারের! *
ওগো প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী,
পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোর না সেই পথকে
যে পথে বিচরণ করেছে তোমার পূর্বপুরুষ!
যদি মানব-জীবন উদ্ভূত হয় ঐক্য থেকে,
তাহলে অবিশ্বাসও সেই ঐক্যেরই উৎসমূল।

যদি তুমি না হতে পার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসী,
অনুপযুক্ত তুমি পূজা দেবার
ঈশ্বরের পূজা-বেদীমূলে।
উভয়ই আমরা বিপথে ভক্তিমার্গ থেকে;
তুমি বহুদূরে আজর থেকে
আর আমি এব্রাহিম থেকে। *
মজনু আমাদের পড়ে নি বিমর্ষ হয়ে
তার লায়লার বিরহে:
প্রেমের উন্মত্ততায় হয় নি সে পরিপূর্ণ।
আত্মার প্রদীপ যখন হয় নির্বাপিত,
কি লাভ নভোস্পর্শী কল্পনায়?"

---

* 'অবিশ্বাসের উপবীত'কে মূলগ্রন্থে বলা হয়েছে 'জুন্নার।'
* হযরত ইব্রাহিম আলায়হেসসালামের পিতা আজর ছিলেন পৌত্তলিক।'

একদিন গঙ্গা বললে হিমালয়কে—
তার পরিচ্ছদের ঝুলায়মান অংশ ধারণ করে,—
"ওগো, আবৃত তোমার সর্বাঙ্গ তুষারে
সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে;
বেষ্টিত তোমার কটিদেশ
নদী মেখলায়,
আল্লাহ্ করেছেন তোমায় অংশীদার
স্বর্গীয় রহস্যের,
কিন্তু বঞ্চিত করেছেন তোমার পদকে
মহিমাময় চলনভঙ্গি থেকে।
হরণ করেছেন তিনি তোমার বিচরণ-শক্তি,
কি লাভ তোমার এই উচ্চতায়
আর রাজকীয় ঐশ্বর্যে?
জীবন জাগ্রত হয় বিরামহীন চলার গতি থেকে ;
তরংগের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব বিরাজ করে
তার গতিতে।"

যখন পর্বত শুনলে এই বিদ্রূপ
নদীর কাছ থেকে,—
সে স্ফীত হয়ে উঠল ক্রোধে
অনল-সমুদ্রের মত,
জওয়াব দিল সে—
"তোমার বিস্তৃত জল-রাশি আমার দর্পণ ;
বক্ষে আমার লুক্কায়িত শতেক স্রোতস্বিনী
তোমার মত।
মহিমাময় চলনভঙ্গি তোমার মৃত্যুরই পন্থা ;
যে কেহ পরিত্যাগ করে তার আত্মাকে,
বরণ করে সে মৃত্যু।
জ্ঞান নেই তোমার আপন অবস্থার
উল্লসিত হও তুমি তোমার দুর্ভাগ্যে,
নির্বোধ তুমি।
তুমি তোমার অস্তিত্বকে দিয়েছ ডালি
মহা-সমুদ্রের পায়ে,
নিক্ষেপ করেছ তোমার বহুমূল্য মুদ্রাধার
পথদস্যুর হাতে।

আত্মসমাহিত হও গোলাবের মত
বাগিচার মাঝে,

যেয়ো না পুষ্প-বিক্রেতার কাছে
তোমার সুরভি বিস্তার করতে।
জীবন্ত থাকার মানে আত্মবর্ধিষ্ণু হওয়া
আর জন্ম দেওয়া গোলাবরাজিকে
তোমার আপন পুষ্প-বীথিতে।
যুগযুগান্তর গেছে অতীতের কোলে মিশে
আর আমার চরণ রয়েছে দৃঢ়বদ্ধ
মৃত্তিকার বুকে,
মনে কর তুমি, আমি বহুদূরে
আমার লক্ষ্যস্থল থেকে?
আমার সত্তা জন্মলাভ করল আর পৌঁছে গেল
আকাশের উচ্চতায়,
জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল ডুবে গেল
বিশ্রাম নিতে আমার পরিচ্ছদের তলায়;
সত্তা তোমার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়
মহা-সমুদ্রের বুকে,
কিন্তু শিখরে আমার অবনমিত হয়
তারকারাজির মস্তক।
আঁখি আমার দর্শন করে স্বর্গের রহস্য,
কর্ণ আমার পরিচিত
স্বর্গ-দূতের পক্ষের সাথে।

যখন থেকে আমি দীপ্ত হলাম
অবিরাম শ্রান্তির উত্তাপে,
সঞ্চয় করলাম কত লাল, হীরা আর মণিমাণিক্য।
ভিতরে আমার প্রস্তর,
আর প্রস্তরের মাঝে আছে অগ্নি;
জল পারে না বয়ে যেতে
আমার অগ্নির উপর দিয়ে।
তুমি একটি জলবিন্দু?
ভেঙে যেয়ো না তোমার আপনার পদে,
চেষ্টা কর ফুলে উঠে সমুদ্রের সাথে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে।

আকাঙ্ক্ষা কর তুমি রত্নের প্রভা
হয়ে ওঠ রত্ন।

হয়ে ওঠ কর্ণভূষণ,
সজ্জিত কর এক সুন্দরীকে।
ওগো, বিস্তৃত কর আপনাকে, দ্রুতগতিশীল হও।
হও তুমি মেঘমালা—
যে প্রকাশ করে বিদ্যুৎ-চমক
আর বৃষ্টিবাত্যা!
মহাসমুদ্র অন্বেষণ করুক তোমার ঝটিকা
ভিক্ষুকের মত,
অভিযোগ করুক সে তার পরিচ্ছদের দৈন্যে।
ভাবুক সে তার আপনাকে তরংগের চেয়ে ক্ষুদ্রতর,
আর প্রবাহিত হোক তোমার চরণতলে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

[মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য আল্লার বাণীকে সার্থক করা। জেহাদের মূলে যদি থাকে রাজ্যলোভ তা হলে তা ইস্‌লামের বিধি-বহির্ভূত।]

রঞ্জিত করে তোল তোমার অন্তরকে
আল্লার রঙে,
সম্মান ও গৌরব দান কর প্রেমকে।
মুসলিমের প্রকৃতি বিরাজমান প্রেমের ভিতরে ;
মুসলিম যদি না হয় প্রেমিক,
কাফের সে।
আল্লার উপরে নির্ভর করে তার দেখা, না-দেখা,
তার পানাহার ও নিদ্রা।
তার ইচ্ছার ভিতরে হারিয়ে যায় আল্লার ইচ্ছা,
"কী করে বিশ্বাস করবে মানুষ এই বাণী?" *
শিবির সন্নিবেশ করে সে
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র' ক্ষেত্রে,
মানবের কাছে সে প্রতিভূ এই বিশ্বে। *
তার উচ্চ পদমর্যাদার সাক্ষ্য সেই মহান নবী
যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানব ও জ্বীনের কাছে,
প্রতিভূ সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী।
পরিত্যাগ কর বাণী আর অন্বেষণ কর সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা
বর্ষণ কর আল্লার জ্যোতি
তোমার কর্মের অন্ধকারে।
যদিও সজ্জিত তুমি রাজকীয় পরিচ্ছদে,
জীবন ধারণ কর দরবেশের মত,
বেঁচে থাক জাগ্রতভাবে আল্লার ধ্যানে!

* মওলানা রুমি খুব সুন্দরভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন। হযরত রসুল (দঃ) যখন বালকমাত্র, তখন একদিন তিনি মরুভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধাত্রী হালিমা তখন দুঃখে আত্মহারা হয়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। তিনি তখন অদৃশ্য বাণী শুনতে পেলেন— 'দুঃখ কর না. তিনি তোমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবেন না; বরং সারা বিশ্ব যাবে হারিয়ে তার ভিতরে। সত্যিকার ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যায় না এই বিশ্বের বুকে বরং বিশ্বই হারিয়ে যায় তার ভিতরে। ইক্‌বালের দর্শনমতে তাঁর ইচ্ছা আল্লার ইচ্ছা যায় হারিয়ে।

* সত্যিকার মুসলিমের জীবনই তার আদর্শকে প্রমাণিত করে।

যা কিছু কর তুমি,
লক্ষ্য হোক তোমার আল্লার নৈকট্যলাভ,
যেন তাঁর গৌরব প্রকাশিত হয়
তোমা দ্বারা।
শান্তি হয়ে ওঠে অশান্তি, — যদি তার উদ্দেশ্য হয় অপর কিছু ;
যুদ্ধ তখনই শ্রেয়,
যখন তার লক্ষ্য হয় আল্লাহ্।
যদি আল্লার গৌরব সপ্রকাশ না হয়
আমাদের তরবারি দ্বারা,
তখন যুদ্ধ অবমানিত করে মানবকে।

মহান শেখ মিঞা মীর ওয়ালী—*
আত্মার জ্যোতিতে যাঁর সপ্রকাশ হয়েছিল
সকল গোপন পদার্থ,
পদযুগ ছিল তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ মুহাম্মদের পথে,
তিনি ছিলেন বীণা
আবেগময়ী প্রেম-সংগীতের।
সমাধি তাঁর সুরক্ষিত করে আমাদের নগরকে
অনিষ্ট থেকে,
বিচ্ছুরিত করে সত্যধর্মের জ্যোতি আমাদের উপরে।
স্বর্গ ঝুঁকে পড়েছিল তাঁর চলার পথে,
শিষ্য ছিলেন তাঁর ভারত-সম্রাট।+
এই সম্রাট বপন করেছিলেন আকাঙ্ক্ষার বীজ
তাঁর অন্তরে,
আর সংকল্প করেছিলেন দিগ্বিজয়ের।
ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার অগ্নি ছিল প্রজ্বলিত তাঁর অন্তরে,
শিখিয়েছিলেন তিনি তাঁর অসিকে জিজ্ঞেস করতে,
"আরো আছে কিছু বাকি ?"

দক্ষিণ ভারতে ছিল মহাসমর-কোলাহল,
দণ্ডায়মান ছিল তাঁর সেনাবাহিনী সমর-ক্ষেত্রে।
গিয়েছিলেন তিনি নভোস্পর্শী সম্মানের আধার শেখের কাছে,
লাভ করতে তাঁর আশীর্বাদ,
মুসলিম আবর্তন করে বিশ্ব থেকে

* একজন মুসলিম তাপস। ১৬৩৫ খৃস্টাব্দে লাহোরে তিনি দেহত্যাগ করেন।
+ সুবিখ্যাত মোগল-সম্রাট শাহজাহান।

আল্লার দিকে,
শক্তিশালী করে তার কর্মধারাকে প্রার্থনা দ্বারা।
সম্রাটের কথায় শেখ দিলেন না কোনো জওয়াব,
দরবেশমণ্ডলী ছিলেন শ্রবণোন্মুখ,
যতক্ষণ না এক শিষ্য,
হস্তে এক মুদ্রা,
খুললে তার মুখ
আর ভাঙলে নিস্তব্ধতা।
বললে সে— "গ্রহণ করুন আমার এ দীন তোহ্‌ফা,
ওগো ঐশী পথভ্রষ্টদলের পরিচালক!
ঘর্মাক্ত হয়েছিল আমার সর্বাংগ
অর্জন করতে একটি দির্‌হাম।"

শেখ বল্‌লেন,
"প্রদান করা উচিত এই অর্থ
আমাদের সুলতানকে,
ভিক্ষুক যিনি রাজকীয় পরিচ্ছদে।
যদিও প্রভুত্ব তাঁর চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডলীর উপরে,
তথাপি সম্রাট আমাদের সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব
মানব জাতির ভিতরে।
দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ অপরের মুখের অন্নের প্রতি,
তাঁর ক্ষুধার অনল গ্রাস করেছে বিপুল বিশ্ব।
তরবারি তাঁর আনয়ন করেছে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী,
সৌধ তাঁর পতিত করেছে
বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড।
মানব-মণ্ডলীর কান্না উঠছে
তাঁর দারিদ্র্যের জন্য ;
রিক্ততা তাঁর লুণ্ঠন করছে দুর্বলকে।
শক্তি তাঁর সকলের দুশ্‌মন :
মানব জাতি হচ্ছে কাফেলা
আর তিনি দস্যু।
তার আত্মপ্রবঞ্চনা ও নির্বুদ্ধিতায়
দস্যুবৃত্তিকে তিনি অভিহিত করছেন
সাম্রাজ্য বলে।
তাঁর রাজকীয় সৈন্যদল আর শত্রুবাহিনী
উভয়ই খণ্ডিত হচ্ছে
তাঁর বুভুক্ষার অসিতে।

ভিক্ষুকের ক্ষুধা গ্রাস করে তাঁর আপন আত্মাকে,
কিন্তু সুলতানের ক্ষুধা ধ্বংস করে
রাজ্য আর ধর্ম।
যে কেহ গ্রহণ করবে তরবারি
অপর কিছুর জন্য
আল্লাহ্ ছাড়া,
তরবারি তার বিদ্ধ হবে
তার আপন বক্ষে।"

ষোড়শ অধ্যায়

[ভারতীয় মুসলিমদের জন্য উপদেশ। উপদেষ্টা মীর নাজাত নকস্‌বন্দ, যিনি বাবা সহ্‌রাই বলে সাধারণতঃ পরিচিত। *]

ওগো, তুমি জন্মলাভ করেছ মৃত্তিকা থেকে,
গোলাবের মত,
তুমিও উদ্ভূত আত্মার জঠর থেকে।
পরিত্যাগ কর না আত্মাকে !
অবস্থান কর তার অভ্যন্তরে !
হও তুমি সলিল-বিন্দু এবং পান কর মহা-সমুদ্রকে !
আত্মার আলোকে যেমন প্রোজ্জ্বল তুমি,
আত্মাকে করে তোল শক্তিমান,
তবেই তুমি হবে স্থায়ী।
তুমি লাভবান হও এই বাণিজ্য দ্বারা,
লাভ কর তুমি সম্পদ
রক্ষণ করে এই পণ্যদ্রব্য !
সত্তা তুমি
আর ভীত তুমি অসত্তার জন্য ?
প্রিয় বন্ধু, ভ্রান্ত তোমার ধারণা
যেহেতু পরিচিত আমি জীবনের ঐক্যতানের সাথে,
বলব তোমায় আমি জীবন-রহস্য—
নিমজ্জমান হওয়া তোমার আপনার ভিতরে
মুক্তার মত,
তারপর জাগ্রত হওয়া
তোমার অন্তরের নির্জনতা থেকে ;
অগ্নিস্ফুলিংগ সংগ্রহ করা ভস্মের ভিতর থেকে,
অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে ঝলসে দেওয়া
মানব-চক্ষু।
যাও, দাহন কর চল্লিশ বছরের নিদারুণ দুঃখের গৃহ,
আবর্তন কর আপনার চতুর্দিকে !
হয়ে ওঠ ধূমায়িত বহ্নিশিখা !

---

* এখানে মূল গ্রন্থকার একটি কল্পিত নাম গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

জীবন কি অপরের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে মরার দুঃখ থেকে
মুক্তি ছাড়া,
আর আপনার অন্তরকে পবিত্রতার মন্দির,
জ্ঞান না করে?

সঞ্চালন কর তোমার পক্ষ
আর মুক্ত হও পৃথিবীর আকর্ষণ থেকে ;
মুক্তি লাভ কর পতন থেকে বিহংগের মত।
যতক্ষণ তুমি না হও পক্ষী,
বুদ্ধির সাথে তুমি বাঁধবে না নীড়
গুহার উর্ধ্বে।
ওগো, আকাঙ্ক্ষা কর যে জ্ঞান আহরণ করতে,
বলছি আমি তোমায় রুমের তাপসের বাণী—
"জ্ঞান— যদি থাকে তোমার চর্মের উপরে,
ভূজংগ সে,
জ্ঞান,— যদি তুমি গ্রহণ কর অন্তরে,
সে হবে তোমার বন্ধু।"

জান তুমি কী করে রুমি
দর্শনের বাণী প্রচার করেছিলেন আলেপ্পোতে?
জ্ঞানের নিদর্শনে দৃঢ়বদ্ধ,
সঞ্চালিত বুদ্ধির অন্ধকার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে,
এক মুসা অপ্রাপ্ত-জ্যোতি
প্রেমের সিনাই থেকে,
অপরিচিত প্রেম এবং প্রেমের অনুরাগের সাথে।
আলোচনা করেছিলেন তিনি সংশয়বাদ
আর নবপ্লেটোবাদ নিয়ে,
আর গেঁথেছিলেন তত্ত্বদর্শনের বহু দীপ্তিমান মুক্তা।
সমাধান করেছিলেন তিনি ভ্রাম্যমাণদের সমস্যা,—
চিন্তার আলোক তাঁর স্পষ্ট করেছিল,
যা ছিল অস্পষ্ট।
পুস্তকরাশি বিস্তৃত ছিল তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ও সম্মুখে,
তাদের রহস্যের কুঞ্জিকা ছিল
তাঁর ওষ্ঠদেশে।

কামালের * অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত শামস্‌-ই-তাব্‌রিজ
প্রবেশ-প্রার্থী হলেন
জালাল উদ্দীন রুমির বিদ্যায়তনে
আর বললেন চীৎকার করে—
"কী এসব কোলাহল আর নিরর্থক প্রলাপ?
কী এত সব বিচার, বিতর্ক
আর প্রদর্শনী?"
"শান্ত হও, নির্বোধ!" —বললেন মৌলবি—
"হেস না ঋষিদের মতবাদে।
বেরিয়ে যাও তুমি আমার বিদ্যায়তন থেকে।
এসব হচ্ছে যুক্তি আর আলোচনা :
কী করবে তুমি এ দিয়ে?
আমার আলোচনা তোমার বুদ্ধির বহির্ভূত,
সমুজ্জ্বল করে তাতে অনুভূতির কাঁচকে।"
এই বাণী বর্ধিত করলে শামস্‌-ই-তাবরিজের ক্রোধ,
আর ধূমায়িত করলে এক অগ্নিশিখা
তাঁর অন্তর থেকে।
দৃষ্টির বিদ্যুচ্ছটা তাঁর নিপতিত হল
ভূমিপৃষ্ঠে,
নিশ্বাসের দীপ্তি তার ধূলিকণাকে পরিণত করলে
অনল-শিখায়।
আধ্যাত্মিক অগ্নি দগ্ধীভূত করলে জ্ঞানের স্তূপকে
আর গ্রাস করলে দার্শনিকের পুস্তকাগার।
মৌলবি যে ছিল অজ্ঞ প্রেমের রহস্যে—
আর অপরিচিত প্রেমের ঐক্যতানের সাথে,—
বললেন চীৎকার করে :
"কী করে তুমি প্রজ্জ্বলিত করলে এই অগ্নি
যাতে দগ্ধীভূত করল
দার্শনিকদের পুস্তকরাশি?"
উত্তর দিলেন শেখ,
"ওহে অবিশ্বাসী মুসলিম,
এ হচ্ছে স্বপ্ন আর উল্লাস ;
কী করবে তুমি এ দিয়ে?
অবস্থা আমার তোমার চিন্তার বহির্ভূত,
অগ্নিশিখা আমার স্পর্শমণিতত্ত্বজ্ঞের অমৃত।"

* বাবা কামালউদ্দীন জুন্দী। শামস্‌-ই-তাব্‌রিজ ও রুমির ভিতরের সম্বন্ধ জানবার জন্য Dr. R.A. Nicholson, Litt, D., LL.D. প্রণীত 'Selected Poems from the Divani Shams-i-Tabriz (Cambridge, 1891)" দ্রষ্টব্য।

তুমি সংগ্রহ করেছ তোমার সার
দর্শনের তুষার থেকে,
তোমার চিন্তার মেঘ বর্ষণ করে না আর কিছু
শিলা ব্যতীত।
তোমার ভগ্ন প্রস্তরের মাঝে প্রজ্বলিত কর এক অগ্নি,
পোষণ কর এক অনল শিখা
তোমার মৃত্তিকার বুকে।

মুসলিমের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে
আধ্যাত্মিক উপাদানে,
ইস্‌লামের অর্থ—বর্জন করা
যা যাবে অতীতের কোলে মিশে।
এব্রাহিম যখন মুক্ত হলেন
অস্তগামীর মায়া থেকে, *
উপবিষ্ট হলেন তিনি অনল-কুণ্ডে—
অক্ষত দেহে। +
তুমি স্থাপন করেছ আল্লার জ্ঞানকে
তোমার পশ্চাতে
আর অপচয় করেছো তোমার ধর্ম
রুটিকা-খণ্ডের জন্য।
অতি ব্যস্ত তুমি অঞ্জনের সন্ধানে,
অপরিচিত তুমি তোমার আপন আঁখির
কৃষ্ণতার সাথে।
সন্ধান কর জীবন-নির্ঝর অসির মুখে,
আর স্বর্গীয় কাওসার দানবের মুখ থেকে,
ছিনিয়ে নাও কৃষ্ণ প্রস্তর
বোত্‌ খানার দরজা থেকে,
আর উন্মাদ কুকুর থেকে কস্তুরী মৃগের নাভিমূল,
কিন্তু আশা কর না প্রেমের দীপ্তি
আজিকার জ্ঞান থেকে,
চেয়ো না সত্যের প্রকৃতি কাফেরের পিয়ালায়!

দীর্ঘকাল আমি বিচরণ করেছি এদিক ওদিকে,
শিক্ষা করে নবীন জ্ঞানের রহস্য ;

* হয্‌রত এব্রাহিম (আঃ) সূর্য, চন্দ্র ও তারকামণ্ডলীর পূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, —"আমি প্রেম করি না তাদেরকে, যারা অস্তগমন করে।" (কোরান)

\+ হয্‌রত এব্রাহিম (আঃ) নমরুদের অনল-কুণ্ডে অক্ষতদেহে বসেছিলেন।

মালীরা আমায় স্থাপন করেছে পরীক্ষার মুখে
আর করেছে আমায় পরিচিত
তাদের গোলাবের সাথে।
গোলাবরাজি !
পুষ্পদল বরং সতর্ক করে তাদের ঘ্রাণ গ্রহণ না করতে,
কাগজের গোলাবের ন্যায়,
গন্ধের মরীচিকা মাত্র।
যেদিন থেকে এই বাগিচা আর মুগ্ধ করে না আমায়,
আমি বেঁধেছি আমার নীড় স্বর্গীয় বৃক্ষ-চূড়ে।

আধুনিক জ্ঞান সর্বাপেক্ষা বড়ো অন্ধ,—
মূর্তি-পূজা, মূর্তি-বিক্রয়, মূর্তি-নির্মাণ !
প্রকৃতির বন্দীখানায় নিগড়বদ্ধ,—
সে ছাড়িয়ে যায় নি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের সীমানা।
জীবন-সেতু পার হতে গিয়ে সে হয়েছে নিপতিত,
সে চালিয়েছে ছুরিকা তার আপন গলদেশে।
অগ্নি তার শীতল পুষ্পের শিখার মত,
অনল-শিখা তার শিলার মত ঘনীভূত।
প্রকৃতি তার থাকে অস্পষ্ট
প্রেমের দীপ্তি দ্বারা,
চির-নিরত সে আনন্দহীন অনুসন্ধানে।
প্রেম হচ্ছে এক প্লেটো,
মুক্ত করতে অন্তরের ব্যাধি, *
অস্ত্র তার দূরীভূত করে অন্তরের বিমর্ষতা।

নিখিল বিশ্ব ভক্তি-বিনত হয় প্রেমের কাছে,
প্রেম হল মাহ্‌মুদ
যে জয় করে জ্ঞানের সোমনাথ। +
আধুনিক বিজ্ঞানের পিয়ালায় আছে অভাব সেই প্রাচীন
সুরা-রসের
রাত্রি তার নহে মুখরিত
আবেগময় ফরইয়াদে।
তুমি ঘৃণা করেছ তোমার আপন সাইপ্রেসকে,
আর অপরের সাইপ্রেস্‌কে মনে করেছ উচ্চতর।

---

* মস্‌নভী শরীফে প্রেমকে বলা হয়েছে, 'আমাদের অহংকার ও আত্ম-প্রতারণার চিকিৎসক, আমাদের প্লেটো আর গ্যালেন।'

\+ গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করেছিলেন।

নলের মত
তুমি শূন্য করেছ তোমার অন্তরকে
অপরের সংগীতে।

ওগো, যে ভিক্ষা কর একটি কণিকা
অপরের কৃপার ভাণ্ডার থেকে,

আকাঙ্ক্ষা করবে তুমি আপনার সম্পদ
অপরের বিপণিতে?
মুসলিমদের মজলিসগৃহ দগ্ধ হয়
আগন্তুকের প্রদীপ দ্বারা,
মসজিদ তার দগ্ধীভূত হয় সন্ন্যাসের স্ফুলিংগে।
মৃগী যখন পলায়ন করলে
মক্কার পবিত্রভূমি থেকে,
শিকারীর তীর বিদ্ধ করলে তার পার্শ্বদেশ। *
গোলাব-পত্র বিস্তৃত হয়েছে,
তার খোশ্‌বুর ন্যায়,
ওগো, যে পলায়ন করেছ আত্মার দিক থেকে,
প্রত্যাবর্তন কর তার দিকে!

ওগো, কোরআনের জ্ঞানে স্বত্বাধিকারী,
খুঁজে লও তোমার হারানো ঐক্য পুনর্বার!
আমরা যারা ইসলামের দুর্গদ্বার-রক্ষী,
হয়েছি অবিশ্বাসী
অবহেলা করে ইস্‌লামের রক্ষাকবচ।
প্রাচীন সাকীর পাত্র হয়েছে বিচূর্ণ,
হেজাজের সুরা-বিক্রেতাদল আজ বিচ্ছিন্ন।
কাবা পরিপূর্ণ আমাদের মূর্তিতে,
কুফ্‌র* বিদ্রূপ করছে আমাদের ইসলামকে।
শেখ আমাদের ইসলামকে বলি দিয়েছে
মূর্তির প্রেমে
আর ধরেছে জুন্নারের জপমালা। +
ঐশী পথনির্দেশকারী আমাদের হয়েছে পদপ্রার্থী
শুভ্র-কেশের কাছে
আর পথচারী শিশুদের কাছেও হয়েছে হাস্যাস্পদ

* মক্কার পবিত্র ভূমিতে শিকার করা তীর্থযাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ।
* কুফ্‌র—অবিশ্বাস।
+ 'জুন্নার' অগ্নিপূজকের উপবীত।।

অন্তরে তাদের অংকিত নেই ঈমানের দাগ,
আবাস সেথায় ইন্দ্রিয়পরতার মূর্তির।
প্রত্যেক দীর্ঘকেশ ব্যক্তি পরিধান করছে
দরবেশী পোষাক,
আফ্‌সোস্‌ এই সব ধর্ম-বণিকদের জন্য !
রাত্রিদিন তারা পরিভ্রমণ করছে শিষ্যপরিবেষ্টিত,
অজ্ঞ তারা ইস্‌লামের সত্যিকার প্রয়োজন সম্বন্ধে !
আঁখি তাদের দীপ্তিহীন—
নার্গিস ফুলের মত,
বক্ষ তাদের শূন্য আধ্যাত্মিক সম্পদে।

পীর আর সুফি,—
পূজা করছে সবাই দুনিয়াদারীর সমানভাবে ;
পবিত্র ধর্মের মহিমা হল বিনষ্ট।
পীর আমাদের নিবদ্ধ করলে তার দৃষ্টি
বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতি,
আর ধর্মের মুফতি বিক্রয় করলে তার ফতোয়া।
এর পরে, ওগো বন্ধু,
কী করব আমরা ?
পীর আমাদের ফিরিয়েছে তার মুখ
মদ্য-শালার দিকে।

সপ্তদশ অধ্যায়

[সময় হচ্ছে তরবারি]

তৃণশ্যামল হোক্ শাফীর * পবিত্র সমাধি–ক্ষেত্র,
দ্রাক্ষা যাঁর আনন্দ পরিবেশন করেছে
সমগ্র বিশ্বে !

চিন্তাধারা তাঁর আহরণ করেছে একটি তারকা
আকাশের কোল থেকে ;
কালের নামকরণ করেছিলেন তিনি
"একখানি কর্তনকারী তরবারি।"

কী করে বলব আমি—
কি সেই তরবারির রহস্য ?
দীপ্তিমান মুখাগ্রে তার জীবন বিরাজমান।
মালিক তার অত্যুচ্চ আশা এবং ভীতির ঊর্ধ্বে,
হস্ত তার শুভ্রতর মুসার হস্তের চেয়ে।
এক আঘাতে তার জল নির্গত হয়
পর্বত–গাত্র থেকে
আর সাগর হয়ে যায় ভূমিখণ্ড রসের অভাবে।
মুসা ধারণ করেছিলেন এই তরবারি
তাঁর হস্তে,
তাই সাধন করেছিলেন তিনি—
যা মানব–শক্তিতে অসম্ভব।
দ্বিধা বিদীর্ণ করেছিলেন তিনি লোহিত সাগরকে,
আর তার জলরাশিকে করেছিলেন
শুষ্ক মৃত্তিকার মত,
খয়বর–বিজয়ী আলীর বাহু
বল সংগ্রহ করেছিল এই একই তরবারি থেকে।
দর্শনীয় আকাশের আবর্তন,
লক্ষ্যযোগ্য নিত্য পরিবর্তন দিবস ও রাত্রির।*

* শাফী (রাঃ) মুসলমানদের বিখ্যাত চারি ইমামের অন্যতম।
* কালের প্রকৃতি ও অর্থের দিকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে।

লক্ষ্য কর,
ওগো, যারা অতীত ও ভবিষ্যতের মায়া-মুগ্ধ,
দর্শন কর আর এক বিশ্ব তোমার হৃদয় মাঝে!
তুমি বপন করেছ অন্ধকারের বীজ তোমার কর্দমে,
একটি রেখা বলে কল্পনা করেছ তুমি কালকে;
চিন্তা তোমার সময়ের পরিমাপ করে
রাত্রি-দিবার পরিমাপের সাথে।
এই রেখাকে করে তোল মেখলা
তোমার অবিশ্বাসী কটিদেশে;
তুমি মিথ্যার বিজ্ঞাপন-কারী
মৃন্মূর্তির মত।

ছিলে তুমি অমৃত,
পরিণত হয়েছ ধূলি-মুষ্টিতে;
সত্যের বিবেকরূপে জন্ম তোমার
আর হলে তুমি মিথ্যা!
মুসলিম তুমি?
তা হলে ছিঁড়ে ফেল এই পরিবেষ্টন!
হও তুমি দীপবর্তিকা মুক্ত-স্বাধীনের মজলিসে!
না জেনে কালের মূল উৎস,
অজ্ঞ তুমি চিরন্তন জীবন সম্বন্ধে
আর কতকাল তুমি থাকবে দাস
রাত্রি-দিবার?
জেনে লও রহস্য কালের
এই বাণী থেকে,—
"আমার সময় নির্ধারিত আছে আল্লার সাথে।*
বিশ্ব-প্রকৃতি জাগ্রত হয় কালের গতি থেকে,
কালের অন্যতম রহস্য এই জীবন।
সময়ের কারণ নহে সূর্যের আবর্তন;
কাল চিরন্তন,
কিন্তু সূর্য নহে স্থায়ী চিরদিনের জন্য।

কালই হচ্ছে আনন্দ ও দুঃখ,
উৎসব ও উপবাস,
কালই চন্দ্রালোক ও সূর্যালোকের রহস্য।

* মহানবী বলেছিলেন—"আমার সময় নির্ধারিত আছে আল্লার সাথে এমন ভাবে যে, কোনো ফেরেশ্‌তা বা পয়গাম্বর আমার সমকক্ষ হতে পারেন না।" তিনি নিজেকে কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ মনে করতেন না।

বিস্তৃত করেছ তুমি কালকে
ভূমির মত
আর প্রভেদ রচনা করেছ
অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে।
পলায়ন করেছ তুমি সুরভির মত
তোমার আপন বাগিচা থেকে,
রচনা করেছ তোমার জিন্দানখানা
তোমার আপন হাতে।
কাল আমাদের—
যার নেই কোনো আদি-অন্ত,
প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে আমাদের অন্তরের ফুল-বাগিচা থেকে।
তার মূল রহস্যের জ্ঞান
অনুপ্রাণিত করে জীবন্তকে নব-জীবনে ;
সত্তা তার দীপ্ততর সূর্যকরোজ্জ্বল উষার চেয়ে।
জীবন হচ্ছে কালের
আর কাল জীবনের ;
"অপব্যয় কর না সময়ের।"—
এই ছিল আদেশ মহান নবীর।

আহা,—জেগে ওঠে স্মৃতি সেই গৌরবময় দিবসের
কালের অসি যখন সম্মিলিত হয়েছিল
আমাদের বাহুর শক্তির সাথে!*
বপন করেছিলাম আমরা ধর্মের বীজ
মানবের অন্তরে,
অবগুণ্ঠন-মুক্ত করেছিলাম সত্যের মুখ,
নখর আমাদের দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করেছিল
এই পৃথিবীর বন্ধন,
নামাজে আমাদের সেজদা আশীষ বর্ষণ করেছে
বিশ্বের বুকে।
সত্যের সোরাহী থেকে উৎসারিত করেছিলাম আমরা
গোলাবী সুরারস,
অভিযান করেছিলাম আমরা
প্রাচীন শুঁড়িখানার বিরুদ্ধে।

ওগো, পাত্র ভরা যাদের প্রাচীন সুরা,
যে সুরার উষ্ণতায় দ্রবীভূত হয়ে
গেলাস পরিণত হয় জলে,

* যে গৌরবময় যুগে মুসলিম জাতি অভিযান করেছিল বিশ্বকে প্রেমে দীক্ষা দিয়ে। জয় করবার জন্য।

তারা গর্ব, ঔদ্ধত্য আর আত্ম-অহংকারে মেতে
বিদ্রূপ কর আমাদের রিক্ততায়?
আমাদেরও পিয়ালা গৌরবান্বিত করেছে
বিশ্ব-মজলিসকে ;
বক্ষে আমাদের পরিপূর্ণ ছিল এক অপূর্ব তেজ।
নবযুগ জাগ্রত হয়েছে অনন্ত গৌরবে
আমাদের চরণ-ধূলি থেকে
শোণিত আমাদের জল-সিক্ত করেছে
আল্লার ফসলকে,
আল্লার উপাসকরা সকলে ঋণী
আমাদের কাছে।
তক্‌বির আমাদেরই দান বিশ্বের বুকে।*
কর্দমে আমাদের নির্মিত হয়েছে কত কাবা।
আল্লাহ্‌ কোরআন শিখিয়েছেন আমাদের দ্বারা,
বণ্টন করেছেন তাঁর অনুগ্রহ
আমাদেরই হাতে।

যদিও রাজমুকুট আর রাজত্ব চলে গেছে
আমাদের হাত থেকে,
তবু চেয়ো না ঘৃণার দৃষ্টিতে আমাদের পানে
এই ভিক্ষুক-জনোচিত দারিদ্র্যে।
অপদার্থ আমরা তোমাদের দৃষ্টিতে,
অতীতের চিন্তায় নিমগ্ন, অবজ্ঞাত।
গৌরব আমাদের 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' থেকে,
রক্ষক আমরা এই বিশ্বের।
বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোলাহল থেকে মুক্ত আমরা,
শপথ গ্রহণ করেছি অদ্বিতীয়ের প্রেমের,
বিবেক আমরা লুক্কায়িত বিশ্ব-প্রভুর অন্তরে,
উত্তরাধিকারী আমরা মুসা ও হারুণের।
জ্যোতিতে আমাদের
উজ্জ্বল চন্দ্র-সূর্য,
বিদ্যুৎ-ঝলক আজো আছে লুক্কায়িত
আমাদের মেঘের বুকে।
অন্তরে আমাদের প্রতিবিম্বিত হয়
স্বর্গের প্রতিচ্ছবি ;
মুস্‌লিমের সত্তাই আল্লার অন্যতম নিদর্শন।

* তকবির-ধ্বনি—"আল্লাহ আকবর"—আল্লাহ্‌ মহত্তম।

অষ্টাদশ অধ্যায়
— প্রার্থনা

ওগো, বিশ্ব-দেহের আত্মা-স্বরূপ,
আত্মা তুমি আমাদের
আর চির-পলাতক তুমি আমাদের কাছ থেকে।

সংগীত-ঝংকার তোল তুমি জীবন-বীণায় ;
মৃত্যুকে জীবন ঈর্ষা করে তখনই,
যখন সে মৃত্যু তোমার জন্য।
দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরে আমাদের
আর একবার এনে দাও শান্তি,
আর একবার আসন গ্রহণ কর
আমাদের বক্ষোতলে !
আর একবার দাবি কর আমাদের কাছ থেকে
নাম ও যশের কোরবানী,
শক্তিমান কর আমাদের দুর্বল প্রেমকে !
অভিযোগ করছি আমাদের দুর্ভাগ্যে,
মহার্ঘ্য তুমি আর আমরা মূল্যহীন।
রিক্তহস্ত আমাদের কাছে
আবৃত কর না তোমার সুন্দর মুখ।
বিক্রয় কর সুলভে
সোলেমান আর বেলালের প্রেম !*
দাও আমাদেরকে বিনিদ্র চক্ষু
আর অনুতাপ-ভরা অন্তর,
আবার দাও আমাদেরকে পারদের স্বভাব !
খুলে দাও তোমার প্রকাশ্য নিদর্শন
আমাদের আঁখির সম্মুখে
যেন আমাদের দুশমনের শির
হয়ে পড়ে অবনত !
এই আবর্জনা-স্তূপকে করে তোল
অনল-চূড়া-বিশিষ্ট পর্বত,

* সোলেমান ছিলেন ফারসী আর বেলাল হাব্সী। উভয়ই ক্রীতদাস ছিলেন। এরা দুজনেই সাধনাবলে অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক সম্মান লাভ করেছিলেন। এঁরা মহাপুরুষ মুহাম্মদের (দঃ) খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন।

দাহন কর আমাদের অগ্নিতে
যা কিছু নহে ঐশ্বরিক।
মুসলিম যখন ছেড়ে দিল ঐক্য-সূত্র
তাদের হস্ত থেকে,
হয়ে পড়ল তারা শতধা বিচ্ছিন্ন।
বিক্ষিপ্ত আমরা বিশ্বের বুকে নক্ষত্ররাজির মত :
যদিও সন্তান আমরা একই পরিবারের,
অপরিচিত আমরা একে অন্যের কাছে।

বেঁধে দাও একই গ্রন্থিতে এই বিক্ষিপ্ত পত্ররাজিকে,
পুনর্জাগ্রত কর প্রেমের নীতি !
টেনে নাও আমাদেরকে সেই প্রাচীন যুগের মত
তোমার সেবায়,
ইচ্ছা তোমার পূর্ণ কর তাদের জীবনে
প্রেম করে যারা তোমায় !
দাও আমাদেরকে এব্রাহিমের বলিষ্ঠ ঈমান ;
জানিয়ে দাও আমাদেরকে 'লা-ইলাহা'র অর্থ,
পরিচিত কর আমাদেরকে
'ইল্লাল্লাহ্'র রহস্যের সাথে !

জ্বলছি আমি অপরের জন্য
মোমের প্রদীপের ন্যায়,
শিখাও আমায় মোমের প্রদীপের কান্না।
ওগো আল্লাহ্,
যে অশ্রু অন্তর-উজ্জ্বলকারী,
অনুরাগ-প্রসূত, বেদনায় উদ্ভূত, শান্তি-বিনাশক,
তাই যেন আমি বপন করতে পারি
আমার বাগিচায়,
আর তা পরিণত হয় অনল-শিখায়,
যা ধুয়ে নেবে দাহ্যমান কাষ্ঠকে পুষ্পের পরিচ্ছদ থেকে !

অন্তর আমার বিগত গোধূলিতে নিবদ্ধ
আর আঁখি অনাগত ঊষার প্রতি ;
জন কোলাহলের মাঝে আমি নিঃসংগ—একা।
প্রত্যেকেই ভান করছে আমার বন্ধুত্বের,
কিন্তু কেউ জানল না গোপন রহস্য
আমার অন্তরের।
ওহ কোথায় আমার সাথি এই বিপুল বিশ্বে ?
আমি সিনাই-কুঞ্জ :
কোথায় আমার মুসা ?

বিশ্বাস-হন্তা আমি,
কত অন্যায় করেছি আমি আমার আত্মার উপর,
পোষণ করেছি আমি এক অগ্নি-শিখা
আমার বক্ষমাঝে,
যে অগ্নিশিখা বুদ্ধিকে করেছে ভস্মীভূত,
অনল-সংযোগ করেছে বিবেকের পরিচ্ছদে,
উন্মত্ততার সাথে শিখিয়েছে যে উদ্ধত যুক্তি,
জ্ঞানের অস্তিত্বকে করেছে যে অগ্নিময়।
দীপ্তি তার সিংহাসনারূঢ় করে সূর্যকে আকাশ-লোকে,
আর বিদ্যুৎ-চমক বেষ্টন করে তাকে
চিরন্তন উপাসনা দ্বারা।
আঁখি আমার মুষড়ে পড়ল কান্নায়
শিশির-বিন্দুর মত,
যখন থেকে আমায় দেওয়া হয়েছে সেই গোপন অগ্নি শিখা।

শিখিয়েছিলাম আমি মোমের প্রদীপকে ক্রন্দন করতে
উন্মুক্তভাবে,
যখন আমি নিজকে দগ্ধীভূত করেছিলাম
বিশ্বের আঁখি দ্বারা।
তারপর আমার প্রত্যেক কেশাগ্র থেকে নির্গত হল অগ্নিশিখা,
আমার চিন্তার শিরা থেকে
পতিত হল অনল-কণা :
বুলবুল আমার আহরণ করেছিল অগ্নি-স্ফুলিংগ,
আর সৃষ্টি করেছিল অগ্নিময়ী গীতি।
হৃদয়হীন এ যুগের বক্ষ
মজ্‌নুন, ছট্‌ফট্‌ করছে বেদনায়,
কারণ লায়লার হাওদা আজ শূন্য।
মোমের প্রদীপের পক্ষে সহজ নয়
স্পন্দিত হওয়া একাকী :
আহা, নেই কি পতংগ আমার যোগ্য ?
কত কাল আমি প্রতীক্ষা করব
আমার দুঃখভাগীর ?
কত কাল সন্ধান করব
একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ?

ওগো,—মুখ যার আলোক দান করে
চন্দ্র ও তারকারাজিকে,
সংবরণ কর তোমার অগ্নি আমার আত্মা থেকে।

প্রতিগ্রহণ কর—যা দিয়েছ আমার বক্ষে,
দূর কর এই হন্তারক দীপ্তি আমার দর্পণ থেকে,
অথবা দাও আমায় এক প্রাচীন সঙ্গী,
যে হবে আমার দর্পণ
সর্বগ্রাসী প্রেমের।
সমুদ্রের বুকে তরংগ নেচে চলে তরংগের সাথে ;
প্রত্যেকেরই আছে অংশী তার আবর্তনে।
আকাশে তারকা সম্মিলিত হয় তারকার সাথে
আর দীপ্তিমান চন্দ্র তার মস্তক স্থাপন করে
রাত্রির জানুদেশে।
প্রভাত স্পর্শ করে রাত্রির অন্ধকার ভাগ,
আজিকার গোধূলি ভর করে
কালিকার ঊষার গায়ে।
এক নদী হারিয়ে ফেলে তার সত্তা অপরের মাঝে,
এক ঝাপটা বাতাস মরে যায়
সুরভির মাঝখানে।
নির্জন অরণ্যের প্রতি কোণে চলছে
অবিরাম নৃত্য,
উন্মাদ নৃত্য করে উন্মাদের সাথে।
কারণ সত্তায় তুমি অখণ্ড,
আবর্তন করেছ তুমি এই বিপুল বিশ্ব
আপনার আনন্দে।
উদ্যানের পুষ্প সমতুল আমি,
বিরাট জনতার মধ্যে আমি নিঃসংগ—একা।
ভিক্ষা করি তোমার কাছে আমি
একটি সহানুভূতিশীল বন্ধু,
পরিচিত আমার প্রকৃতির সাথে,
যে বন্ধু (ঐশী) মত্ততা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ,
পরিচয় নেই যার ব্যর্থতার অপচ্ছায়ার সাথে,
যেন আমি গোপন করতে পারি আমার ব্যথা-বিলাপ
তার আত্মায়
আর দেখতে পাই পুনর্বার আমার মুখ
তার অন্তরে।
মূর্তি তার আমি গড়ে তুলব আমার আপন কর্দমে,
আমি হব তার তাছে—
মূর্তি আর পূজারী—দুই।

তামাম শোদ

Lutfur Rahman Farooqui
Lecturer/Research Associate
Da'wah Academy
International Islamic University
ISLAMABAD

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
46702
LAHORE

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলা ভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র